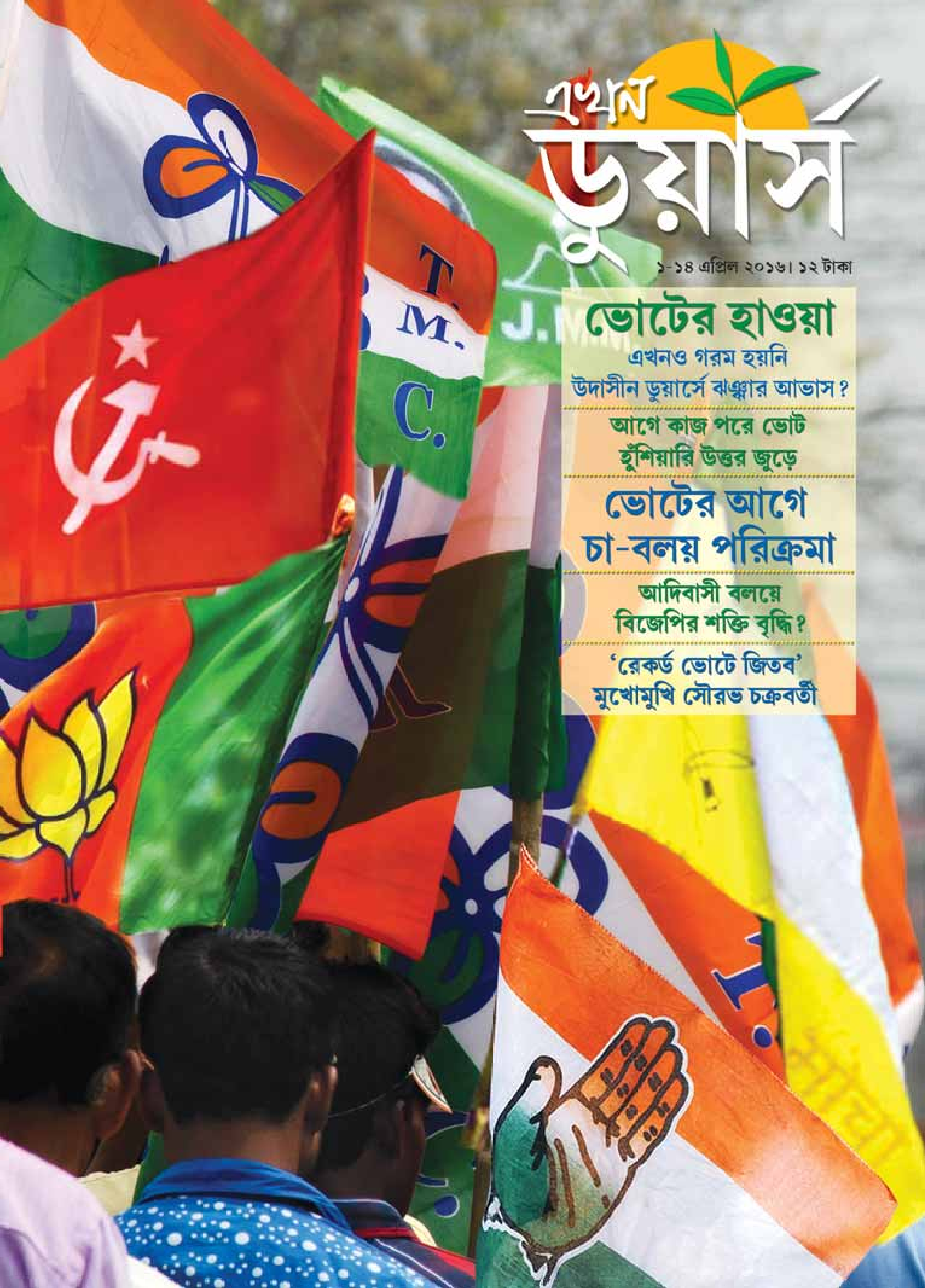

এখন ডুয়ার্স

১-১৪ এপ্রিল ২০১৬। ১২ টাকা

ভোটের হাওয়া

এখনও গরম হয়নি
উদাসীন ডুয়ার্সে ঝঞ্ঝার আভাস?

আগে কাজ পরে ভোট
হুঁশিয়ারি উত্তর জুড়ে

ভোটের আগে চা-বলয় পরিক্রমা

আদিবাসী বলয়ে
বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি?

'রেকর্ড ভোটে জিতব'
মুখোমুখি সৌরভ চক্রবর্তী

তৃতীয় বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১-১৪ এপ্রিল ২০১৬

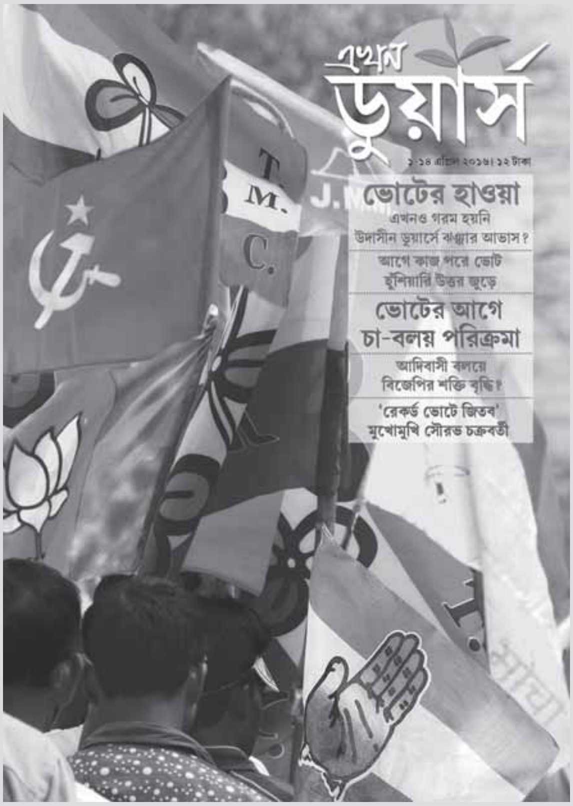

বনের সবুজ গালচে জুড়ে ঘাসের মধ্যে ফুল
বসন্ত আজ ডুয়ার্স ভরে নেমেছে বিলকুল
আমরা কিন্তু এমনি ফুটি রাজনীতি নেই মোটে
যেমন করে বনের ঝিলে পদ্ম পাপড়ি ফোটে!

যেমন করে কাস্তে কাটে ভরন্ত মাঠটাকে
যেমন করে ওই হাতুড়ি পাথর ঝাঁকে ঝাঁকে
ভাঙতে থাকে, শক্ত হাতের মুঠোয় বাঁচার ফাইট
ভুটান পাহাড় থেকে নামাই টাটকা ডিনামাইট!

গাঢ় সবুজ নতুন পাতায় বাসন্তী আজ বন
রক্ত লালের আকাশ কখন উদাসী স্যাফ্রন
রং নিয়ে আজ চুলোচুলি-রঙেই ডুয়ার্স খাঁটি
খুলুক বাগান, ফসলে হোক গর্ভবতী মাটি!

ভাঙার কথা অনেক হল, অনেক প্রতিশ্রুতি
পাহাড় সমতলের অঙ্কে হাজার গুঁতোগুঁতি
মৃত্যুমিছিল জঙ্গিপনা কারখানাতে তালা
বঞ্চনারই পাহাড় নিয়ে নিত্য ঝালাপালা!

ভাষণ শ্লোগান মিছিল সভা, তপ্ত হাওয়া জোটে
ডুয়ার্স ভাবে কপালে তার শান্তি যেন জোটে।

ছন্দে অমিত কুমার দে
ছবিতে অমিতেশ চন্দ

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
তৃণমূলকে রুখতে বিরোধিতার পাঠটুকু জানা প্রয়োজন ছিল ৪
তিন বছরে পা দিল 'এখন ডুয়ার্স' ৫
ভোটের হাওয়া গরম হয়নি ডুয়ার্সে, তবে কি ঝড়ের আভাস? ৬
ভোটের আগে চা-বলয় পরিক্রমা ৮
উন্নয়ন নেই তাই বুথমুখী না হওয়ার হুঁশিয়ারি ১৪
মুখোমুখি সৌরভ চক্রবর্তী ২৪

দূরবিন
নেতৃত্বের ব্যাটন তো অশোক ভট্টাচার্যর হাতে তুলে দেওয়া উচিত ২২

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ২০
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ২১
পর্যটনের ডুয়ার্স ২৭
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৭
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৩
শখের বাগান ৪৫
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪৬
খেলাধুলার ডুয়ার্স ৪৭

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ৩০
লাল চন্দন নীল ছবি ৩২
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩৫
তরাই উৎরাই ৩৮

শ্রীমতী ডুয়ার্স
পৃথিবীর সব কোণে ডুয়ার্সের স্মৃতি জেগে থাকে নন্দিতার ৪০
টেক টক ৪২
মেঘপিয়োন ৪২
কিশোরী দিবস উদ্‌যাপন ৪৩
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডুয়ার্স পরিচালনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা

কবিতা বা স্ক্রিপ্ট পাঠ/বৈঠক

টিভিতে ম্যাচ দেখা

সাতটি দৈনিক পত্রিকা

ওয়াই ফাই পরিষেবা

এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা

রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

বাড়িতে বসে 'এখন ডুয়ার্স' পেতে চান?

এখন ডুয়ার্স-এর পাঠকমহলে সাড়া ও চাহিদা দুই-ই বাড়ছে হু হু করে। এপ্রিল ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি শহরে বাড়িতে বা অফিসে নিয়মিত 'এখন ডুয়ার্স' পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হবে এই ব্যবস্থা।

যাঁরা 'এখন ডুয়ার্স' নিয়মিত পেতে চান তাঁরা আজই ফোন করে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং লিপিবদ্ধ করান। পত্রিকা পৌঁছবে সঠিক সময়ে। পত্রিকার দাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তাৎক্ষণিক দাম দেওয়ার ঝামেলা বিদেয় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক গ্রাহক হলে আপনি পাবেন ২৪টি সংখ্যার কুপন। পত্রিকা দিতে আসবেন যিনি তার হাতে কুপনটি ধরিয়ে দিলেই হবে।

আজই আপনার নাম, ঠিকানা গ্রাহক হিসেবে লিখিয়ে রাখুন। ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

তৃণমূলকে রুখতে বিরোধিতার পাঠটুকু জানা প্রয়োজন ছিল বাম-বিজেপি'র

এ যেন সেই রাজার একা একা তরবারি নিয়ে দিনরাত শ্যাডো প্র্যাকটিস করে করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ার উল্লেখ করেই বলতে হয় 'সারদা টু নারদা পুরো কুল, তারই নাম তৃণমূল'। গত পাঁচ বছরের টিএমসি জমানায় কেবল যে নেতৃত্বের অভাবে ভুগেছে বিরোধীরা তা-ই নয়, সেই সঙ্গে শাসকদলের হাজার গলদের ন্যূনতম রাজনৈতিক ফায়দাটুকুও তুলতে পারেনি বাম বা বিজেপি কেউই। এ রাজ্যে নিজেদের ঘর সামলাতেই জেরবার হয়ে যাওয়া দুটি দল ভোটের বাজারে আর নতুন লড়াই কী দেবেন সেটাই প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজেপি-র আসর জমানোর সম্ভাবনা দেখা দিতেই সুযোগলোভীরা যেভাবে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন, যে বাংলার মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়াই যথেষ্ট বিরূপ হয়ে গেল। মিডিয়ার যে একাংশ প্রায় মুক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেছিল, এবার আমরা বিজেপি-কে আনছিই রাজ্যের ক্ষমতায়— তারাও রণে ভঙ্গ দিলেন এবং তারপর বাম-কং জোট নির্মাণে মক্ষ্মে নাযোগী হলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল গত সাড়ে তিন দশকে ময়দানে নেমে লড়াইয়ের কৌশল বা স্পৃহা দুই-ই হারিয়ে বসে আছেন কমরেডরা। কিছুতেই তাদের চাগিয়ে তোলা যাচ্ছে না। কংগেসর দলের কাছে হয়ত আন্দোলন আশা করাটা বৃথা, কিন্তু মমতা যে সময় সবার অলক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে বামেদের অভিনব শাসন কৌশলের তালিম নিয়েছেন, শীতল প্রকোষ্ঠে বসে বাম নেতাদের তখন একবারও মনে হয়নি, বিরোধিতার পাঠটা মমতার কাছ থেকে শিখে নেওয়া যেত! আজকের বিরোধিতাহীন রাজনীতি বা নির্বাচন যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল নয়, সে কথা আবার কি তাদের নতুন করে মনে করাতে হবে?

পঞ্চাশ পেরিয়েও যে প্রেম অটুট

সম্পর্কের বহুচারিতা নিয়ে শত অভিযোগ থাকলেও সিপিএম-এর কংগ্রেস-প্রেম আদি অকৃত্রিম, প্রমাণিত হয়েছে যুগে যুগে। এ এমন এক আশনাই যা বারবার একে অপরকে দূরে সরিয়ে দিলেও 'যুগের প্রয়োজনে' একে অন্যের প্রতি আকর্ষণে ছুটে এসেছে মিলনের তাগিদে।

১৯৬৪— জন্মলগ্নে গৃহীত কর্মসূচিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও বাস্তবে তৎকালীন কংগ্রেসি সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার নীতি সুস্পষ্ট, যাতে কংগ্রেস সরকার আর সব লাল পার্টির মতো তাদের সঙ্গেও দমনমূলক আচরণ না করে।

১৯৬৭— কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলল— কেরালায় মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট সরকার গঠন, মাদ্রাজে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে রামধনু জোটে যোগদান।

১৯৬৮— কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ বজায় রেখে সিপিএম নেতৃত্ব জানালেন, প্রধান শত্রু কংগ্রেসকে হারাবার জন্য জনসংঘের সঙ্গে (অধুনা বিজেপি) হাত মেলাতেও তাঁরা প্রস্তুত।

১৯৬৯— কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিবাদের সময় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধির গোষ্ঠীকে সমর্থন— ইন্দিরা মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ভি ভি গিরিকে ভোট। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আবার পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা বিরোধী বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন।

১৯৭০— যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেস্তে যাওয়ার পর ফের ইন্দিরা গান্ধিকে সমর্থন, বক্তব্য— 'সিপিএম কখনও এ কথা বলেনি যে, কংগ্রেসের মধ্যে কোনও গণতান্ত্রিক শক্তি নেই।'

১৯৭২— পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হার, ভোটে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ, বিধানসভা বয়কট।

১৯৭৭— পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিতে বাংলা দখল।

১৯৮৯— কংগ্রেস বিরোধিতা জারি। একই সময়ের নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপি-র সঙ্গে আর তামিলনাড়ুতে মুসলিম লিগের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি।

১৯৮৯— 'গলি গলি মে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়'— প্রচার সফল করে বিজেপি-র সঙ্গে ভি পি সিং-এর সরকারকে সমর্থন।

১৯৯৯— বিজেপি-র দিল্লির মসনদ পাকাপাকি দখলের পর আতঙ্কিত। আবার হাত বাড়াল কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেসের সঙ্গে মুলায়ম ইত্যাদিকে নিয়ে মহাজোট গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা। সনিয়া গান্ধির প্রশস্তি বাড়তে শুরু করল।

২০০৪— ফের প্রেম এল প্রকাশ্যে। কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন করে সনিয়া-মনমোহনের ইউপিএ সরকারে যোগদান।

২০০৮— আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তির প্রতিবাদের অছিলায় কংগ্রেস চালিত ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার।

২০১১— পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের অবসান, কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের কাছে রেকর্ড পরাজয়। দলের একাংশের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার আক্ষেপ।

২০১২— ফের 'প্যার কি পয়গম'। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রণব মুখার্জিকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন।

২০১৫— পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের ক্ষমতা হারিয়ে ৪ বছরেই পর্যুদস্ত, তৃণমূলকে ঠেকাতে ফের কংগ্রেসের হাত ধরে ভোটে লড়ার প্রস্তাব পলিটব্যুরোতে গৃহীত ও অনুমোদিত।

২০১৬— একই সঙ্গে কেরালায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই আর বাংলায় কংগ্রেসের হাত ধরে লড়াইয়ের অভিনব নীতি। সাড়ে তিন দশকের পুরানো শরিকদের তোয়াক্কা না করে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ প্রচার। (চলবে)

এই আশ্চর্য প্রেম কাহিনি আধুনিক প্রজন্মের ভোটদাতাদের অবগতির জন্য 'এখন ডুয়ার্স' দপ্তরে পাঠিয়েছেন পত্রিকার জনৈক পাঠক সুব্রত দত্ত। তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই বা প্রমাণ করার দায়িত্ব সম্পাদকের নয়, পত্রিকার পাঠকদের।

—**সম্পাদক**, এখন ডুয়ার্স

তিন বছরে পা দিল ‘এখন ডুয়ার্স’

আরেকটা গোটা বছর নিয়মিত কাগজ বার করে তা কয়েক হাজার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া— কাজটা বোধহয় খুব একটা সহজ নয়। এর জন্য টিম ‘এখন ডুয়ার্স’-কে ছাড়া সবার প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাব বিজ্ঞাপনদাতাদের, যাঁদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এ কাজ সম্ভব হত না, হলফ করে বলা যায়। মাসিক থেকে পাক্ষিক— আরেকটা বড় সাহসিক পদক্ষেপ বলেই দাবি করব। কারণ এক, ডুয়ার্সের মতো প্রত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকায় লেখক, ক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা— সবেরেই অভাব। আর দুই, না করেও উপায় নেই, এর পরের পদক্ষেপটাই হল পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক। তবে আমরা জানি, এক পা-দু’পা করেই এগতে হবে আমাদের।

চা, আড্ডা, খবরের কাগজ, টিভি’র জায়ান্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখা— সবমিলিয়ে জমজমাট জলপাইগুড়ির ‘আড্ডাঘর’।

ফোটোগ্রাফারস’ ক্লাব

তৃতীয় বছরে পদার্পণ উপলক্ষে চালু করা হল ‘এখন ডুয়ার্স ফোটোগ্রাফারস’ ক্লাব’। সামান্য খরচায় বার্ষিক সদস্য হয়ে ছবি তুলে পাঠাতে থাকুন ক্লাব ব্যাঙ্কে। মাসে একবার দল বেঁধে ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ, কলকাতায় বাৎসরিক প্রদর্শনীর সুযোগ তো থাকছেই। ডুয়ার্সের পাখি-প্রজাপতি-বন্য প্রাণ-নদী-পাহাড়-জঙ্গল ছাড়াও বহু বিষয় আছে, যেগুলি নিয়ে বাইরের দুনিয়ার লোক আজও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তাঁদের কাছে ডুয়ার্স বলতে দু’-চার দিনের ছুটি কাটানো ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ নানা আন্তর্জাতিক সমস্যা বুকে নিয়ে, নানা ক্ষোভ-অভিমান নিয়ে নির্বিকার জীবন কাটায় এই ভূখণ্ডের মানুষ— যাদের কথা বলবার মতো সত্যি বলতে কেউ নেই। বাণিজ্যে মগ্ন দৈনিক পত্রিকাগুলির উত্তরবঙ্গ সংস্করণ গঙ্গা পেরিয়ে ওখানে যায় না। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা নিজেরাই শুনে শুনে ক্লান্ত এখানকার মানুষগুলি। এদের জীবনের মুহূর্তগুলি লেন্সবন্দি হয়ে থাকুক। তারপর সুযোগ পেলে লাগুক নানা প্রচার-সচেতন হওয়ার কাজে। আর ফোটোগ্রাফারও কিঞ্চিৎ সম্মানিত হোন নতুন নতুন ফ্রেমের অনুপ্রেরণা পেতে। আগামী বারো মাসে হাজারকয়েক দুর্দান্ত ছবির শক্তিতে বলীয়ান হতে চাই আমরা।

ছবি: অমিতেশ চন্দ

Green Tea Resort

Batabari (Near of Batabari Tea Garden, Murti More) Jalpaiguri, Dooars
Resort Contact no. : +91 98749 26156

Kolkata Office - 112, Kalicharan Ghosh Road, Near Baishakhi Sweets, Kolkata- 700050
Kolkata Cont.no - +91 98310 64916, +91 92316 77783
e-mail : greentearesort@gmail.com

ভোটের হাওয়া এখনও গরম হয়নি ডুয়ার্সে তবে কি কোনও ঝড়ের আভাস?

বসন্তের সকাল। নিউ জলপাইগুড়ি পেরতেই মন ফুরফুরে। রোদ আছে, কিন্তু দমবন্ধ গরম নেই। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ধূপগুড়ি স্টেশনে নির্ধারিত সময়ের খানিক পরেই এসে পৌঁছেছে। শুনলাম ক্রসিং আছে, তাই ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। ভাবলাম, নেমেই পড়ি। দূর সম্পর্কের এক দিদির বিয়ে হয়েছিল ধূপগুড়িতে। ছোটবেলায় দারুণ ভাব ছিল দু'জনের। মাকে লুকিয়ে চালতার আচার কিনে খাওয়া, কাকভোরে আম কুড়াতে যাওয়ার স্মৃতি এখনও মন খারাপ করে দেয়। ওর বিয়েতে বিদায়ের সময় মা-পিসিদের চাইতেও অনেক বেশি কেঁদেছিলাম। ভাবলাম, সকাল সকাল ধূপগুড়িতে দিদির বাড়িতে গিয়ে চমকে দেব। ডুয়ার্স-তরাইয়ে এখনও কারও বাড়িতে যেতে অগ্রিম জানাবার প্রয়োজন হয় না, 'অতিথি' শব্দটির সঠিক ভাবার্থ এখনও পালিত হয় এখানে।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই বড় চায়ের দোকান। এক ভাঁড় চা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেই আমেজ, মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ডুয়ার্স। দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা গুটিকয় মানুষকে দেখে মনে হল ট্রেনের নিত্য অফিসযাত্রী। স্থানীয় কায়দায় প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, দাদা, এবার কি কিছু বদল-টদল হবে? নাকি সেই একই চিত্র দেখতে হবে আরও পাঁচ বছর? উত্তর মিলল ভীষণ উদাসীন, দ্যাখেন কী হয়! আর তো কয়টা দিন। আরেকটু গভীরে ঢোকার চেষ্টা করতেই বাদ সাধলেন জনৈক ধোপদুরস্ত— কলকাতা থেকে? ডুয়ার্স ঘুরতে আসছেন বুঝি? খুব ভাল, এই সময় ডুয়ার্সের রূপ খুব সুন্দর, জন্তুজানোয়ারের দেখা পাবেন। কয়টা দিন ছুটি আছে, ভাল করে ঘোরেন। মনে মনে ভাবলাম, নাহ্‌, সাংবাদিকতা আমাকে দিয়ে হবে না, কিছুতেই হবে না।

মধ্য বা সেন্ট্রাল ডুয়ার্স হিসেবে পরিচিত ধূপগুড়ি যেমন ডুয়ার্সের একটি ব্যবসায়িক 'হাব', তেমনই এখানে সিপিএমের দাপট ছিল সুবিদিত। এগারোর পরিবর্তন-ঝড়েও এখানে লাল পতাকা উড়েছে। ইদানীং তৃণমূল তাণ্ডবে বামেরা খানিক হলেও বিভ্রান্ত। স্টেশন থেকে ছোট্ট শহরের চৌমাথায় এলাম। এশিয়ান হাইওয়ের কাজ চলছে। রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ভাঙা হচ্ছে দু'পাশের পুরনো দোকান। ব্যস্ত ট্রাফিক, মানুষ, ব্যবসায়ী। ধূপগুড়ি পালটে যাচ্ছে দ্রুত, কাঁচা পয়সার কবজির জোর এখন সব চালায়। ভোটের আগাম খবর নিয়ে কিছু বলতে নারাজ মানুষ। রাজনীতির চর্চা আশ্চর্যজনকভাবে কম, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে যেন।

আসলে কলকাতায় বসে কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই। মিডিয়া ব্যস্ত জোট নির্মাণে। তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী হবে, নেতৃত্বে কে আসবেন, এসব নিয়ে যদিও তারা আলোকপাত করতে পারেনি বা সময় পায়নি। জোটে মানুষ লাল-তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে দলে দলে পথে নেমে পড়ছেন, এত দিনের বিবদমান নেতা-নেত্রীরা হাসিমুখে গলাগলি করে মিছিলে নেমে ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছেন, সেসব ছবি আমরা রোজ ঘুম থেকে উঠে সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে দেখতে পাচ্ছি। যে ছবি দেখে অনেকেই আবার নিশ্চিন্ত হচ্ছেন— যাক, বাঘে-গোরুতে যে এক ঘাটে জল খায়, সে বিরল ছবিও তো এই জন্মেই প্রত্যক্ষ করে যেতে পারছেন। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে ধন্দ কিছুতেই কাটছিল না। সবাই বলছে, জোটের ভোটে সবার নজর নাকি এবার উত্তরের দিকে, কারণ সেখানে কংগ্রেসের বড়সড় ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং বামেদের দীর্ঘ দিনের সংগঠন তৃণমূল-ঝড়ে এলোমেলো হলেও তার মূল এতটাই গভীরে প্রোথিত যে, ডাক এলেই নাকি গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়বে কাতারে কাতারে মানুষ— যার ধাক্কায় রাজা কুপোকাত হতে বাধ্য। অথচ কলকাতার কাগজে উত্তরের খবর নেই! সবই নাকি তাদের উত্তরবঙ্গ সংস্করণে থাকছে! সে তো কলকাতায় বসে পড়ার উপায় নেই। অতএব ভোট পর্যটনেই বেরিয়ে পড়তে হল ব্যাগ কাঁধে।

ধূপগুড়ি থেকে বাস ধরলাম জলপাইগুড়ির। হাইওয়ে চওড়া করার কাজ চলেছে জোরদার। গাড়ির গতি শ্লথ, কোথাও কোথাও হালকা জ্যাম। কোথাও দেখলাম সারি সারি দাঁড়িয়ে আলুর বস্তা বোঝাই লরি-ম্যাটাডোর ভ্যান। চলাচলের রাস্তা আরও সরু হয়েছে। সব আলু চলেছে হিমঘরের পথে। শুনলাম ডুয়ার্সে এবার আলুর ফলন ভাল, দাম মিলছেও ভাল। বুঝতে চেষ্টা করলাম, কৃষিজীবী, কৃষিনির্ভর মানুষের মন ভাল আছে, বছরের বাকি দিনগুলিকেও আগে নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত করতে চাইছে তারা। সেটাই প্রধান কাজ, ভোট নিয়ে ভাবনাচিন্তা, মিটিং-মিছিল পরেই হবে না হয়!

শহর জলপাইগুড়িতে আগের মতো মানুষ অনেক নিরুত্তাপ। কংগ্রেস-তৃণমূল-সিপিএম এখানে পাশাপাশি সহাবস্থান করে নির্বিবাদে। সুখবিলাসবাবু জলপাইগুড়ির বিধায়ক, এবারও ভোটপ্রার্থী। ফারাক, গতবার জিতেছিলেন তৃণমূলের সমর্থনে, এবার জেতার আশা রাখেন বাম-সমর্থনে। বাম-সমর্থন নয়, বলুন সিপিএমের সমর্থনে— সংশোধন করলেন জনৈক প্রবীণ জলপাইগুড়িবাসী। এখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীই জিততেন এতদিন। কংগ্রেসের সংগঠন শহরেই সীমাবদ্ধ, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তার একটা বড় অংশ চলে গিয়েছে শাসক শিবিরে। সেই হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লকেরই অগ্রাধিকার ছিল প্রার্থী দেওয়ার, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সিপিএম তার নতুন প্রণয়ে পুরনো শরিকদের গুরুত্ব দিচ্ছে না। প্রাতঃভ্রমণে ধরেছিলাম গুটিকয় সিনিয়র সিটিজেনকে— মুখ খুললে এঁরাই খুলবেন এই আশায়। ঠিক তা-ই। একজন শুরু করতেই আরও ছ'জন যোগ করলেন,

সুখবিলাসবাবু ক'দিন জলপাইগুড়িতে থেকেছেন গত পাঁচ বছরে, শহরের নানা সমস্যায় কতটা তাঁকে পাওয়া গিয়েছে— এসব প্রশ্ন উঠছে এখন নাগরিকদের মনে। অন্য দিকে তৃণমূলী গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ধরতিমোহনকে প্রার্থী করাটা খানিকটা কাজের হয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা। কিন্তু সংশয় জাগে, নানা গোষ্ঠীর নেতারা, যাঁরা টিকিটের আশায় থেকে শেষে নিরাশ হয়েছেন, তাঁদের দলবল কি পুরো শক্তি নিয়ে মাঠে নামবেন আদৌ? খানিকটা হতাশার সুর শোনা গেল জনাকয়েক পূর্বপরিচিত তৃণমূল সমর্থকের গলায়। ধূপগুড়ি থেকে বাসে আসবার সময় পাশের আসনে বসা স্কুলশিক্ষকও বলেছিলেন সেই কথা, ভোটের যা খেলা! দেখবেন কোনও কাজ না করেই সুখবিলাস বর্মা জিতে গেলেন।

বিকেলে জোট মিছিলে পা মেলালাম, শেষের দিকে চুপচাপ হেঁটে যাওয়া দু'-একজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নিতে। কংগ্রেস সমর্থক, অকপটে জানালেন, একটু যে সংকোচ বোধ হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কী জানেন দাদা, এলাকায় টিএমসি-র বাড়াবাড়ি আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। রাজনীতি ছাড়তে পারব না, এবার কিছু না হলে বিজেপি-তেই চলে যাব কি না ভাবছি।

বিজেপি-র গল্প সবচাইতে বেশি অনুভূত হল আলিপুরদুয়ারে। সে দিন ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন। সকাল থেকে সাজো-সাজো রব। কয়েক হাজার সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে কপালে লাল তিলক লাগিয়ে সবুজ পাঞ্জাবি পরিহিত সৌরভ চক্রবর্তী এলেন মনোনয়নপত্র জমা দিতে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর প্রার্থীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তা-ই বলে দিচ্ছে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ঘোষিত প্রার্থীর তোয়াক্কা না করে জেলার সিপিএম চেয়ারম্যান কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে প্রকাশ্যে নেমে পড়েছেন, অতএব বিরোধী ভোট ভাগাভাগি অবধারিত। মুখ না খুললেও বিরক্তি গোপন করে রাখতে পারছেন না কোর্ট চত্বরে, বাস স্ট্যান্ডে, ভাতের হোটেলে, চায়ের দোকানে অনেকেই। সিপিএম অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ স্টাইলে প্রচার শুরু করেছে আরএসপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে— ওরা তো টাকা খেয়ে বসে আছে, ক্ষিতি গোস্বামীর এবার টিএমসি সমর্থনে রাজ্যসভার সিট পাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃণমূলিদের পালটা বক্তব্য, জেল হওয়ার আশীর্বাদ এবার আমরা পাচ্ছিই, সৌরভের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ছোটখাটো নমুনা তো মানুষ দেখেই নিয়েছেন। তাই ঘরের ছেলে 'গুটিস'কেই এবার আলিপুরদুয়ারের মানুষ বেছে নেবেন নতুন জেলা শহরের প্রতিনিধি হিসেবে।

আর এসব ছাপিয়ে বিজেপি সমর্থকরা বললেন, আলিপুরদুয়ারে এবার তাঁদের প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে— প্রাক্তন কংগ্রেসি নেতার পুত্র যেমন কংগ্রেস-সিপিএমের 'অশুভ' আঁতাঁতের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব, তেমনই তৃণমূলের অন্যায়-অবিচারের সঠিক সমাধান। তাঁদের দাবি, বহু শাসক বিরোধী ভোট বিজেপি বাক্সে পড়বে, আবার জোটের ঘোঁটে তিতিবিরক্ত মানুষের ভোটও তাঁরা পাবেন। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের নতুন গেট দিয়ে জঙ্গলে ঢোকার সুযোগ হঠাৎ করেই পেয়ে যাওয়ায় মিস করলাম না, সেই ফাঁকে শালকুমার সোনাপুরের লোকজনের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় মেশার সুযোগ পেলাম। বিজেপি সমর্থকদের দাবির সমর্থন পেলাম সেখানেও— বাকিদের তো এতদিন দেখলাম, এবার চলো বিজেপি-কেই দেখা যাক।

আলিপুরদুয়ারে গেলেই যে লোভ কখনওই সামলাতে পারি না— এক, হাটখোলার অমৃতসম ক্ষীরদই আর দুই, রাজভাতখাওয়া। একটা গোটা দিন কেটে গেল ওতেই। পশ্চিমবঙ্গের কনিষ্ঠ জেলাটিকে এক চক্কর মেরে দেখলাম আরেকটা দিন। জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা-সোনাপুর-তোপসির খাতা পেরিয়ে আলিপুরদুয়ার। তারপর জংশন-দমনপুর-হাসিমারা-মাদারিহাট হয়ে ফের ফালাকাটা। সঙ্গী ফোটোগ্রাফার বন্ধুকে বলেছিলাম, জোটবদ্ধ পতাকা বা ফেস্টুন বা দেওয়াল লিখনের ছবি পেলে অবশ্যই যেন সযত্নে তুলে নেন। কিন্তু ফালাকাটা পৌঁছে তিনি হতাশ কণ্ঠে জানালেন, এই পুরো রাস্তাটিতে ছবি তোলার মতো কিছু পাননি। আমারও মন খারাপ হয়েছিল, কারণ নিজেরও সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। আর দপ্তরে সম্পাদকের সন্দিগ্ধ চোখ দু'টির কথা ভেবে— আদৌ ডুয়ার্স ঘুরেছিলেন তো? আলিপুরদুয়ারের এক পুরনো কংগ্রেসি বন্ধু অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, আর ক'টা দিন থেকে যাও, দেখবে ম্যাজিকের মতো সব ভরে গিয়েছে লাল-তেরঙ্গায়। ফলটা আসলে খরগোশ-কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতার মতোই হবে।

তবে জোটেদের গতি কচ্ছপের মতো মনে হলেও খরগোশ ঘুমিয়ে আছে কি না সন্দেহ হল কোচবিহারে পৌঁছে। একেই ভোট শেষ প্রহরে, তার উপর সাধারণ মানুষের নির্বিকারত্ব। যে চা দোকানি গ্লাসে চিনি গুলতে গুলতে বলছেন, এবার টিএমসি সিট বেশিই পাবে, তিনিও ভোটটা টিএমসি-কেই দেন কি না তা নিয়ে ধন্দ রয়েই গেল। জেলার তৃণমূল কর্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় স্তরের নেতা— কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ চাপা থাকছে না মানুষের মধ্যে। ফুটোফাটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে যেভাবে— ভয় হল, দুম করে ফেটে না যায়। ক্ষোভ প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে নিচু স্তরের দলীয় কর্মীদের মধ্যে। পঞ্চায়েত সমিতির এক নেতার স্বীকারোক্তি, ভুলত্রুটি তো হয়েইছে অনেক, যার ফলে অনেক জায়গাতেই লিড নিয়ে বেরিয়ে আসাটাই কঠিন কাজ হবে।

কোচবিহারে ভোটের হাওয়া বুঝতে এখনও বাকি। তবে বিরোধীরা এখনও সত্যিকারের জোটবদ্ধ হতে পারেনি। ফরওয়ার্ড ব্লকের ঘাঁটি এখন দ্বিধাবিভক্ত, তৃণমূলে যোগদান শুরু হয়েছিল সেই ২০০৯ থেকে, আজও তা অব্যাহত। উদয়ন গুহর তৃণমূলে যোগদান নিঃসন্দেহে একটি বড় আঘাত, অস্বীকার করছেন না মানুষ। এখানে বামেদের আশা তৃণমূলের গোষ্ঠীলড়াইয়ের উপর, তেমনই তৃণমূলের আশা অভিভাবকহীন ফরওয়ার্ড ব্লকের সাংগঠনিক দুর্বলতায় এবং জোটে যোগদানে অনীহায়। কংগ্রেস এই প্রান্তিক জেলায় কোনও ফ্যাক্টর নয়, তবু দিনহাটায় নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়া ফজলে হক জোটপ্রার্থীর শিরঃপীড়ার কারণ হতে পারেন। উন্নাসিক ভোটার হাসিমুখে যে ইঙ্গিতটুকু দিচ্ছেন, তাতে যে কোনও বলিষ্ঠ উজ্জ্বল হাসিমুখ কান্নার মেঘ ঢেকে ফেলতে পারে, তেমনই হারা আসন দখল করতে পারে যে কোনও দলই।

ভোটের নাড়ি বুঝতে দোলের ছুটিতে ডুয়ার্স বেড়াতে এসে মানুষের এরকম নীরবতা সত্যি বলছি আশা করিনি। এখানকার মানুষ দক্ষিণের মতো সোচ্চার হতে শেখেননি, হিংসা দূরের ব্যাপার। কিন্তু এবার যেন মনে হল, একটু বেশিই চুপচাপ। এই নিস্তব্ধতাকে বড্ড ভয় পান পোড়-খাওয়া রাজনৈতিক নেতারা। বিরোধীরা ঠিকঠাক জেগে ওঠেনি বলেই ভোটের হাওয়া এখনও ওঠেনি— এই যুক্তি যতটাই বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, সময়টা যে কালবৈশাখীর।

একেই ভোট শেষ প্রহরে, তার উপর সাধারণ মানুষের নির্বিকারত্ব। যে চা দোকানি গ্লাসে চিনি গুলতে গুলতে বলছেন, এবার টিএমসি সিট বেশিই পাবে, তিনিও ভোটটা টিএমসি-কেই দেন কি না তা নিয়ে ধন্দ রয়েই গেল। জেলার তৃণমূল কর্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় স্তরের নেতা— কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ চাপা থাকছে না মানুষের মধ্যে।

উত্তরায়ণ সমাজদার

এখন ডুয়ার্স
এক্সক্লুসিভ

ভোটের আগে চা-বলয় পরিক্রমা

তপন মল্লিক চৌধুরী

বন্ধ কিংবা চালু চা-বাগানে আস্থা মমতাতেই

'মমতাদিদি কো লাই লো... মমতাদিদি কো লাই লো', কালচিনিতে ভোট প্রচারের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী যখন ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগানের জন্য রাজ্য সরকারের নানা অনুদান ও কর্তব্যের খতিয়ান তুলে ধরছেন, তখন তাঁর কণ্ঠ ছাপিয়ে আদিবাসী প্রৌঢ়ার ওই চিৎকার ভেসে ওঠে। সদ্য বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন তাঁর স্বামী। তবু সবেদা বেওয়া সজল নয়নে মমতাদিদিকেই রেখে দেওয়ার জন্য আকুল আবেদন করেন সমবেত হাজার হাজার ডুয়ার্সবাসীকে। তবে কি বন্ধ কিংবা অচল চা-বাগানের চোখের জলেও এই আবেদন ধ্বনিত হচ্ছে?

অর্ধাহার, অনাহার, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গের দৈনিকের পাতায় ছিল শিরোনাম। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের চাল, আটা, রেশন, চিকিৎসার কথাও ছিল ফলাও করে। ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতি, বাম-জমানার উদাসীনতাও। তাহলে অচল বা বন্ধ চা-বাগানগুলির অন্তরের কথা কী? মাদারিহাট-বীরপাড়া বিধানসভা ক্ষেত্রের বন্ধ কিংবা অচল চা-বাগানগুলির আনাচকানাচ ঘুরেও শাসকদল বিরোধী কোনও বিক্ষোভ কিংবা মূল সমেত তাদের উপড়ে ফেলার কোনও ইঙ্গিতই মিলল না।

৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই ডিমডিমা চা-বাগান। বন্ধ ১৩ মাস। ঠিক পরের বাগান নাংডুলা, এখনও পর্যন্ত চালু। ধুমসি নদী পেরিয়ে জয়বীরপাড়া চা-বাগানটিও চলছে। মাঝে তিন মাস বন্ধ ছিল। এর ঠিক পরের চা-বাগান ঢেকলাপাড়া বন্ধ ১২ বছর। রাজ্য সরকার বাগান মালিকের জমির লিজ বাতিল করেছে। ফের চরো নদী পেরিয়ে ভুটান পাহাড়ের গা ঘেঁষে বান্দাপানি চা-বাগান বন্ধ প্রায় তিন বছর।

ডিমডিমা, বান্দাপানি, এমনকি ঢেকলাপাড়ার মতো বন্ধ চা-বাগান যেমন রয়েছে, পাশাপাশি বীরপাড়া, হান্টাপাড়া, গ্যারগারগন্ডা, তুলসীপাড়া, লঙ্কাপাড়া, ধুমচিপাড়ার মতো অন্ধকারে পড়ে থাকা বাগানগুলিও আছে। সম্প্রতি এইসব বাগানে অর্ধাহারে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় বহু চা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর মিছিল নাকি এত দীর্ঘ হয়েছে, যা সভ্যতার ইতিহাসকে লজ্জা দেয়। অথচ ওইসব চা-বাগানের একজন চা শ্রমিকও কিন্তু অর্ধাহার কিংবা অনাহারের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। তবে কি দমনিক খালকো, লরেন্তস খালকো, সিলভাস্তের এক্কা, ফিলিশিয়ান তিগ্গা, ফাবরিয়ানিস টেটে, লক্ষ্মীনারায়ণ নায়েক, কৃষ্ণা মিনচ, হরি পান্না, মারিয়ানিস মিনচ, আনন্দ নায়েক, ঘুরান কুজুর, বিনোদ তাঁতি, কুনা তাঁতি, লক্ষ্মণ মুন্ডা এমন আরও শ'তিনেক চা শ্রমিক সবাই মিথ্যে কথা বলছেন? নাকি সবাই কমিটেড টিএমসি! যদিও এইসব বন্ধ বা অচল চা-বাগানেই এক সময় আরএসপি-র প্রভাব যেমন ছিল, তেমনই পঞ্চায়েতগুলিও ছিল তাদের দখলে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও ছিল আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চাও। সব ক'টিই এখন পালটি খেয়ে তৃণমূলের ঝান্ডাধারী।

ঠিক কী অবস্থায় আছে বন্ধ বা অচল চা-বাগানগুলি? কিংবা কোথা থেকে কীভাবে আসছে তাদের পেট ভরার দানাপানি? এক যুগের উপর যে চা-বাগানটি বন্ধ, তার অধিকাংশ গাছ এখন ঝোপঝাড়, বাকি সামান্য অংশে পুলিং হয়, নতুন পাতাও গজায়। কারা করে সেই কাজ? গত এক যুগে বহু মানুষই যেমন মারা গিয়েছেন, তেমনই কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে গিয়েছে একটা বিরাট অংশ। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা সংখ্যাটাও খুব একটা কম নয়। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ফ্যাক্টরি। পরিত্যক্ত শ্রমিক আবাসনগুলিও ভূতুড়ে বাড়ির আকার ধারণ করেছে। যেগুলিতে মানুষ রয়েছে, তার সব ক'টিতেই ডিশ অ্যান্টেনাসহ টিভি আছে। প্রতিটি শ্রমিক মহল্লাতেই আছে দোকানঘর, নানা ধরনের চাটসহ শুঁড়িখানা। পড়ে থাকা চা শ্রমিকরাই চা গাছ পুলিং, চা-পাতা তোলা, হাতমালাই ইত্যাদি কাজ করে থাকেন অভ্যাসবশেই। ফাউলি মিলছে অধিকাংশ বাগানেই ১৫০০ টাকা করে। সরকারি রেশনে মিলছে পরিবারপিছু ৪ কেজি চাল, ৫ কেজি আটা। তবে ৪৫ বা ৪৭ পয়সার চাল-আটার গল্পটা বেশ ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। ১০০ দিনের কাজও মিলছে, পাশাপাশি আছে নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজ। আট-দশ বছরের শিশুশ্রমিক থেকে প্রৌঢ়— সবাই প্রায় সেই কাজে হাত লাগিয়ে পাচ্ছে ২০-৫০ টাকা পর্যন্ত। প্রায় সমস্ত শ্রমিকের ঘরেই চলে এসেছে অন্তত‌পক্ষে দু'-দু'টি সাইকেল। মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, তার জন্য নানা প্রকল্পের টাকা হাতে আসছে। এক কথায়, কাঁচা টাকা কিন্তু বন্ধ-খোলা-অচল-সচল সব চা-বাগানেই পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত। তার মানে কি তাঁরা দিব্যি আছেন?

> বিরোধীদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই চা শ্রমিকদের। তাঁদের স্পষ্ট কথা, চা-বাগানের এই অবস্থা দু'-তিন বছরের তো নয়, দু'-তিন দশকের। তখন তো দিদিও ছিলেন না, ফাউলিও মিলত না। বাগানের রেশনটুকু মিলত ঠিকই, তবে মালিক খেয়ালখুশিমতো বাগান চালাত, আবার বন্ধও করে দিত। দিনের পর দিন পাওনাগন্ডা বাকি রাখত, পিএফ জমা দিত না। এভাবে বহু ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু মালিকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন কি কেউ কোনও জোরদার আওয়াজ তুলেছিল? আজও বাগান বন্ধ হচ্ছে, অচল করে রাখা হচ্ছে, পাওনাগন্ডা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে, কিন্তু সরকারের সাহায্য মিলছে।

বাগান খুলুক, সাইরেন বেজে উঠুক, ফের চালু হোক রোজকার কাজ— এটাই কিন্তু প্রতিটি চা শ্রমিকের অন্তরের কথা। কারণ, এই দান, অনুদান, সাহায্য, সহযোগিতা— কোনওটাই তাঁরা মাথা পেতে মেনে নিতে পারছেন না। এ কথা তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় না বললেও আকারে-ইঙ্গিতে কিন্তু ব্যক্ত করলেন। পেট ভরার তাগিদে হাত পেতে নিলেও ওগুলো যে আসলে ভিক্ষা তা তাঁরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছেন। তা বলে যে তাঁরা শাসকদলের প্রতি বিক্ষুব্ধ কিংবা অসন্তুষ্ট, এমন কথা একজনের মুখেও শোনা গেল না। ক্ষোভ এবং অসন্তোষ যথেষ্টই আছে সরকারের প্রতি, সরকারের দলের প্রতিও। কিন্তু তার থেকেও বেশি ভালবাসা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে। বন্ধ ঢেকলাপাড়া চা-বাগানের ফিটারবাবুর থেকে জানা গেল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী এসে তাঁদের বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের বাগানে চারাগাছ দিচ্ছি, আপনারা বাগান নিজেদের দায়িত্বে শুরু করুন'। তারপর প্রায় বছর দুই পেরতে চলল, তাঁর ছায়া পড়েনি মাদারিহাট-বীরপাড়া চা বলয়ে।

তাহলে তো শাসকদলের পক্ষে এবারের ভোটে বন্ধ বা অচল চা-বাগান কাঁটা হয়েই

বেঁধার কথা। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। কারণ বিরোধীদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই চা শ্রমিকদের। তাঁদের স্পষ্ট কথা, চা-বাগানের এই অবস্থা দু'-তিন বছরের তো নয়, দু'-তিন দশকের। তখন তো দিদিও ছিলেন না, ফাউলিও মিলত না। বাগানের রেশনটুকু মিলত ঠিকই, তবে মালিক খেয়ালখুশিমতো বাগান চালাত, আবার বন্ধও করে দিত। দিনের পর দিন পাওনাগন্ডা বাকি রাখত, পিএফ জমা দিত না। এভাবে বহু ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু মালিকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন কি কেউ কোনও জোরদার আওয়াজ তুলেছিল? আজও বাগান বন্ধ হচ্ছে, অচল করে রাখা হচ্ছে, পাওনাগন্ডা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে, কিন্তু সরকারের সাহায্যও মিলছে। একশো দিনের কাজ মিলছে। মেয়েরাও এখন আর হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে নেই, সরকারি বহু প্রকল্পে তাদের কাজ মিলেছে। তারাও পরিবারের জন্য কিছু টাকা রোজগার করছে। বাগান ধুঁকছে, কোথাও শুকিয়েও যাচ্ছে, কিন্তু বাগানের চা শ্রমিকরা যে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছেন— এ ধরনের প্রচার আর ধোপে টিকছে না, অন্তত এই ভোটের বাজারে। তাহলে কি ভোট এবারও দিদির পক্ষেই যাচ্ছে? ডানকানসের বাগান ছাড়াও ডুয়ার্সের আরও বহু বাগান অচল করে রেখেছে মালিকপক্ষ। এর সঙ্গে বন্ধ বাগান তো আছেই। ডুয়ার্সের চা-বাগান এবং অন্যতম শিল্পের এই করুণ চিত্র কি কোনওভাবেই শাসকদলকে এবার ভোটে কোণঠাসা করতে পারবে না? বিরোধী দলের সব থেকে বড় অস্ত্রই তো বন্ধ চা-বাগানের দুর্দশা।

বিষয় হল চা-বাগানের ভোট, বিশেষ করে আদিবাসী চা শ্রমিকদের ভোটের রসায়ন শহর বা গ্রামাঞ্চলের মতো নয় মোটেও। মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনও দলই ভোট প্রচারে পা রাখেনি চা বলয়ে। এমনকি শাসকদলেরও কোনও প্রার্থী তো দূরের কথা, কর্মী-সমর্থকরাও চা-বাগানের ভোট নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেনি। চা-বাগানের মানুষদের থেকেই জানা গেল, এখনও প্রচারে ঢের দেরি। সবে তো ভোটের বাদ্যি বেজেছে শহরে। সড়কপথেই প্রার্থীরা ঘুরছেন-ফিরছেন, মিটিং-মিছিল করছেন। এর পর তাঁরা যাবেন গ্রামাঞ্চলে, তারও পরে আসবেন চা-বাগানে। তার থেকেও বড় কথা, চা শ্রমিকরা কাকে ভোট দেবেন, সে ব্যাপারে কি কোনও রাজনৈতিক দল আজ পর্যন্ত নানা কাজের ফিরিস্তি দিয়ে প্রভাব খাটাতে পেরেছে? চা-বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীরা, বিশেষ করে আদিবাসীরা কাকে ভোট দেবেন, তার অঙ্ক শেষ হয় ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে। সেখানে ভোটারকে শুধু প্রভাবিত নয়, আদেশ দেন পঞ্চায়েতপ্রধান, খ্রিস্টান আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ধর্মগুরু। এটাই ডুয়ার্সের চা-বাগানের বহুদিনকার রীতি। এবার যে তার অন্যথা হবে, তার কি কোনও কারণ ঘটেছে?

যখন এ রাজ্য তথা ডুয়ার্সে প্রায় চার দশক যাবৎ অন্য জমানা বিরাজ করেছে, তখন চা বলয়কে শাসন করত আরএসপি প্রভাবিত চা সংগঠন তথা বাম সংগঠনগুলি। তখনও ভোটের অঙ্ক নির্ধারিত হত গ্রাম পঞ্চায়েতপ্রধান এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ধর্মগুরুর আদেশ অনুসারে। ২০১১-র ভোটের ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণতই যে অন্যরকম ছিল, তা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি চা বলয়ের অধিকাংশ পঞ্চায়েত এবং তার প্রধান তৃণমূলের দখলে। চা-বাগানের পরিস্থিতি নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ যেমন আছে, ক্ষোভও কিছু কম নেই। কিন্তু তাঁরা কেউই শাসকদলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন, এমন ক্ষমতা রাখেন না। বরং বেশ কয়েকজন এমন প্রশ্নও করেছেন, যদি দিদিমণিকে ভোট না দিয়ে অন্য কাউকে ভোট দিই, আর তারা যদি কোথাও কোথাও ক্ষমতাতেও আসে, তখন নিজেদের সমস্যা নিয়ে যখন তাদের সামনে দাঁড়াব, তখন তারাই তো বলবে, যাদের ভোট দিয়েছিলে, এখন তাদের গিয়ে বলো। বন্ধ বা অচল চা-বাগানের ভোট কোন দিকে? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁদের তুলে ধরা প্রশ্নেরই সম্মুখীন হতে হল।

চা-বাগানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত শাসকদল তাদের দায় ও কর্তব্যর যে খতিয়ান কথায় ও কাজে রাখতে পেরেছে, তার কোনও বিকল্পই কেউ তুলে ধরতে পারেনি। এটা একদিক দিয়ে বলা যায় শাসকদলের হাতকেই শক্তিশালী করে দেওয়া। তা ছাড়া বিরোধী দল নিজেরাও ঠিক কীভাবে শাসকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তার রণকৌশল এখনও পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে ভোটযুদ্ধে বিরোধীরা শাসকদলের থেকে অনেক কদম পিছনেই রয়ে গিয়েছে। এক তো তাদের সাংগঠনিক শক্তির ঘাটতি, তারপরও খামতি রয়ে গিয়েছে রণকৌশলে। ফলে চা বলয়ের ভোটারদের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি করে উঠতে পারেনি বিরোধীরা। উলটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট প্রচারের প্রথম সফরে ডুয়ার্সবাসীদের সামনে বন্ধ চা বলয়ে তাঁর সরকারের সাফল্যের যে খতিয়ান তুলে ধরেছেন, তাতে এখনও পর্যন্ত বিরোধীদের মুখ সেলোটেপেই সাঁটা।

বন্ধ কিংবা অচল চা-বাগানের পাশাপাশি ডুয়ার্সের চালু চা-বাগানগুলির অবস্থাও যে খুব ভাল তা তো বলা যাবে না। কিন্তু সেখানেও যে ভোটের বাজারে বিরোধীরা শাসকদলের ভাবমূর্তিতে কাঁটা ছড়াতে পেরেছে— এমনটাও বলা যাচ্ছে না। চালু বাগানগুলির শ্রমিক মহল্লায় পানীয় জল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। সেটাও মাত্র কয়েক বছরের ঘটনা নয়। তা নিয়ে শ্রমিকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল বাম-জমানা থেকেই। মালিকপক্ষ তখন মুনাফার লোভে শ্রমিকস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে উৎপাদনেই ব্যস্ত থাকত। চা-বাগানের শ্রমিক সংগঠন থেকে শুরু করে এলাকার পঞ্চায়েতগুলিও তখন ছিল বামেদেরই দখলে। আজ যখন বিরোধীরা শ্রমিকস্বার্থ থেকে শুরু করে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন কিন্তু চালু চা-বাগান শ্রমিক-কর্মচারীরাই অতীতের সঙ্গে আজকের অবস্থার কোনও ফারাক খুঁজে পান না। বরং তাঁদের কাছে আজকের বিরোধীদের প্রকৃত চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলত গয়েরকাটা, হলদিবাড়ি, তেলিপাড়া, মরাঘাট, বিন্নাগুড়ি, বানারহাটসহ আরও বেশ কয়েকটি চালু বাগানের এবারের ভোটের ঝোঁক কোন দিকে জানতে গিয়েও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

পাঁচ বছর না হয় শাসকদল চা-বাগান নিয়ে কোনও কথা বলেনি। কিন্তু আজ বিরোধীরা চা-বাগান নিয়ে যেসব কথা বলছে, তা তো আসলে মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তাকে আঘাত করতেই। এতদিন তাদের চোখ কেন পড়েনি চা-বাগানের পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নিয়ে? আসলে চা-বাগানে সমস্যা শুরু থেকেই ছিল। সময়ে সময়ে তার রকমফের হয়েছে। বাগান বন্ধও হয়েছে, শ্রমিকও মরেছে, কিন্তু এমনভাবে কখনও প্রচারে আসেনি। আজ চা-বাগান মিডিয়ার কাছে খুব লোভনীয় খাদ্য। তারা এটাকে ব্যবহার করছে একভাবে, আর অন্যভাবে ভোটের বাজারে ফায়দা তুলতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি।

ডানকানস সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চা বলয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু সেই ফায়দাও তুলে নিতে অসুবিধে হবে না মুখ্যমন্ত্রীর, কারণ এখনও তাঁর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি ডুয়ার্সের বন্ধ কিংবা চালু চা-বাগানে।

> চা-বাগানে সমস্যা শুরু থেকেই ছিল। সময়ে সময়ে তার রকমফের হয়েছে। বাগান বন্ধও হয়েছে, শ্রমিকও মরেছে, কিন্তু এমনভাবে কখনও প্রচারে আসেনি। আজ চা-বাগান মিডিয়ার কাছে খুব লোভনীয় খাদ্য। আর অন্যভাবে ভোটের বাজারে ফায়দা তুলতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি।

আদিবাসী ভোটার বড় ফ্যাক্টর সত্যিই কি নিশ্চিন্ত হতে পারছে তৃণমূল?

ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, মাল ও নাগরাকাটা— এই চারটি কেন্দ্রের আওতায় পড়ে বহু চা-বাগান। আর এই চা-বাগানগুলিতে আদিবাসী মানুষের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। ফলে এই বাগানগুলিতে তাদের যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনই ওই চারটি কেন্দ্রের বিধানসভা ভোটেও তাদের গুরুত্ব মোটেই অস্বীকার করা যায় না। জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি বাদ দিলে আদিবাসীদের ভোট যে একটা ফ্যাক্টর, তার মূল্য বোঝে রাজনৈতিক দলগুলিও। এখানে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি ছাড়াও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কারস ইউনিয়ন, প্রগ্রেসিভ পিপলস পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মতো বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। এককালে সংগঠনগুলি কাছাকাছি থাকলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পরবর্তীতে আলাদা হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আদিবাসী ভোট বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। ফলে তাদের সমর্থন আদায়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলই মাঠে নেমেছে।

সূত্রের খবর, আদিবাসী ভোট ভাগাভাগির রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, তারা ভোট নিয়ে ডাবল রোল প্লে করবে না, এমন কথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে রেখেছে ভেঙে যাওয়া বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন। এমনকি তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সমস্ত প্রার্থীকেই সমর্থন করবেন বলে ওই সূত্রের খবরেই জানা গিয়েছে। গত ১৪ মার্চ জলপাইগুড়ি মালবাজারে তৃণমূলের কুমারগ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থী জেমস কুজুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই কথা ঘোষণা করেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য সভাপতি বীরসা তিরকি। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জেমস কুজুর ওই দিনই মালবাজারে বীরসা তিরকির সঙ্গে দেখা করেন। প্রসঙ্গত, জেমস কুজুর জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন। প্রার্থী হওয়ার জন্য আগেই স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। তাঁর থেকে জানা গেল, তিনি নাকি পুলিশে চাকরি করাকালীনই বিকাশ পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অন্য দিকে, এই বিকাশ পরিষদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই হাতে তৈরি সংগঠন। তাই পরিষদের মতো সংগঠনের সমর্থন চাইতেই জেমস কুজুর বীরসা তিরকির সঙ্গে দেখা করেন তাঁদের সমর্থনলাভের আশায়। তিনি এ কথাও বলেন, তিনি বীরসা তিরকিকে কুমারগ্রামে নিয়ে যাবেন তাঁর হয়ে প্রচারের জন্য।

বাম-আমলে পৃথক আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর তুলে দেওয়া হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে নিজের অধীনেই আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর গঠন করেন। তৈরি করেন ডুয়ার্স-তরাই আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদ। এই পর্ষদের মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়। ফলে এই আদিবাসীরা যে দিদির তৃণমূলের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন তা কি আর বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে? আদিবাসীরা যে তৃণমূলকে সমর্থন ছাড়া অন্য কোনও দিকে ঝুঁকবেন না, সে কথাও সাফ জানিয়ে দেন বীরসা তিরকি। যদিও জোসেফ মুন্ডার মতো কংগ্রেস নেতা থেকে শুরু করে সিপিএম নেতা জিয়াউল আলম, এমনকি বিজেপি-র জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি দীপেন্দ্রনাথ প্রামানিক আদিবাসীদের তৃণমূলকে সমর্থন নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন— এমন একটা ভাবই দেখাচ্ছেন। আসলে যে তাঁরা আদিবাসী ভোট নিয়ে চিন্তিত তা তাঁদের হাবেভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আদিবাসী ভোট পাওয়া নিয়ে যে কোনও চিন্তা নেই তা নেত্রী উত্তরবঙ্গ ভোট প্রচার সফরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গাতেই জোর গলায় জানিয়েছেন। তিনি এ কথাও বলেন, আদিবাসীদের ভোট তাঁর দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। কারণ তাঁর সরকারই কলেজ, করম পুজোর ছুটি, ডুয়ার্সে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট গঠনসহ আদিবাসীদের জন্য বহু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। এসব আদিবাসী সমাজ মনে রাখে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, মাল ও নাগরাকাটা বিধানসভায় চা-বাগান রয়েছে— ধূপগুড়িতে ২২টি, রাজগঞ্জে ১০টি, মালে ১৬টি ও নাগরাকাটায় ১৪টি। এই এলাকাগুলিতে এখনও আদিবাসী সংগঠনগুলির প্রভাব কমবেশি রয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা, প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কারস ইউনিয়ন, প্রগ্রেসিভ পিপলস পার্টি এবং আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ভাঙন হওয়ার পরও সংগঠনগুলির প্রভাব কিন্তু রয়ে গিয়েছে আদিবাসী মানুষদের উপর। এদের প্রত্যেকেরই চা-বাগানের সংগঠন রয়েছে। তবে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের একটি গোষ্ঠী জন বারলা ও বীরসা তিরকির গোষ্ঠীর প্রভাব সব থেকে বেশি।

ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আদিবাসীদের সমর্থন আদায় করে নেওয়ায় তারা যে এ বিষয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। অন্য দিকে, বিরোধীরা যে আদিবাসী ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছনে, সে কথাও উল্লেখ করতে হয়। ফলত, এই চারটি কেন্দ্রেই আদিবাসী ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর হওয়ায় চিন্তিত বিরোধী দল।

আদিবাসী বলয়ে বিজেপি'র ভরসা জোগাচ্ছে মাদারিহাট

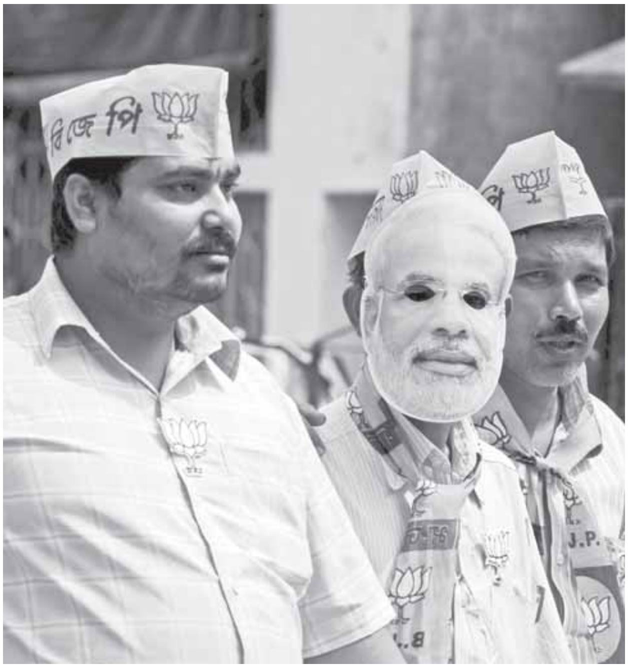

গত ১৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে দলীয় সভা করেছিলেন, সেই বীরপাড়া সার্কাস ময়দানে আগামী ১৪ এপ্রিল বিজেপি-র জনসভায় ভাষণ দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আচমকা হলেও এই তোড়জোড়ের পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাদারিহাট আসনে যেখানে আরএসপি পেয়েছিল ৪২৫৩৯টি ভোট, সেখানে বিজেপি পেয়েছিল ৩৪৬৩০টি ভোট। কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের থেকেও অন্তত‌পক্ষে আট হাজারের বেশি কিছু ভোট পেয়েছিল তারা। আর আরএসপি-র প্রার্থী কুমারী কুজুরের সঙ্গে বিজেপি-র মনোজ টিগ্গার ব্যবধান ছিল ৭৯০৯ ভোটের। অন্য দিকে লোকসভা ভোটে বিজেপি এই আসনে ৫৮৪১৩ ভোট পেয়ে বাম ও শাসকদল উভয়কেই ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়ে লিড কুড়িয়েছিল। তাই আলিপুরদুয়ার বিধানসভায় জয়ের প্রত্যাশা ছেড়ে কালচিনি, নাগরাকাটা ও মাদারিহাটে ঘাম ঝরাচ্ছে বিজেপি।

দলের কর্মীদের একটা বড় অংশ সাফ জানাল, আলিপুরে আলো জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু এখানে ভোল্টেজ হাই। স্বভাবতই প্রচার জোরদার হলে আসন ছিনিয়ে নেওয়া কোনও ব্যাপার হবে না। দলের আর-এক অংশ আলিপুরদুয়ার আসনটির উপর ভরসা পাচ্ছে না। তারা মাদারিহাটকেই তুরুপের তাস বলে মনে করছে। যদিও আলিপুরদুয়ারে রূপা গাঙ্গুলি প্রচার সেরে ফেলেছেন, কিন্তু ভোট বাজারে বিজেপি পাখির চোখ করেছে কালচিনি, নাগরাকাটা ও মাদারিহাটকে। বাস্তবে এও দেখা যাচ্ছে, যেসব বিধানসভা বিজেপি-র শক্ত ঘাঁটি, সেখানেই নানা দফায় আলোচনা, মিছিল, নির্বাচনী কাজ চলছে জোরকদমে।

ব্যতিক্রম আলিপুরদুয়ার। এই জেলার চা বলয়ের মাদারিহাট কেন্দ্রে বাস করেন মূলত নেপালি, আদিবাসী ও বাঙালি ছাড়াও বহু হিন্দি ভাষী মানুষ। নেপালি ও হিন্দি ভাষীদের এই ভোট ব্যাঙ্ক এক সময় ছিল আরএসপি-র ঝুলিতে। কিন্তু গত লোকসভা ভোটে আরএসপি-র থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নেপালিরা। ফলে সেই ভোট ব্যাঙ্ক হারাতে হয়েছিল বামেদের। অন্য দিকে নেপালি ও হিন্দি ভাষীদের ভোট চলে গিয়েছিল বিজেপি-র ভোট বাক্সে। লোকসভা ভোটে ঢেকলাপাড়া ও বান্দাপানির মতো বন্ধ চা-বাগানেও পদ্ম ফুলের চাষ হয়েছিল।

ভোট পরিসংখ্যান এ কথাও বলে, ওই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার মাদারিহাটের সাতটি অচল চা-বাগানকে বেছে নিল অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি জারির তালিকায়। বিজেপি নেতা-কর্মীরাই শুধু নন, রাজনৈতিক মহলেরও ধারণা, এতে বিজেপি খানিকটা তো বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত যে পর্যায়েই পৌঁছাক না কেন, গেরুয়া শিবির তাদের ভোট প্রচারে এই অধিগ্রহণের কথা তো ফলাও করে তুলে ধরবেই। ফলে মাদারিহাট আসনে শাসকদলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে যতটা না বিজেপি, তার থেকে অনেক বেশি নেপালি ও হিন্দি ভাষী ভোট ব্যাঙ্ক। তা সত্ত্বেও আলিপুরদুয়ারের চেয়ে মাদারিহাট আসনেই ঘাম ঝরাচ্ছেন বিজেপি-র কর্মী ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ।

এই কেন্দ্রের নেপালি ও হিন্দি ভাষী মানুষদের একটা বিরাট অংশের চলাফেরা ও কথাবার্তা থেকে যে ইঙ্গিত মিলছে, তার ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না শাসকদলের নেতা-কর্মীদেরও। টাউন ব্লক কমিটির সভাপতি কুশল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই কেন্দ্রের মানুষ তৃণমূলের, বিশেষ করে বন্ধ চা-বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে, এমনকি বাম-কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থের জোটকে মোটেও ভাল চোখে দেখছেন না। ফলে তাঁরা তো বিজেপি-র উপরেই আস্থা রাখতে বাধ্য হবেন। এরকম অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচার ভাষণ যে আলাদা মাত্রা যোগ করবে, সে ব্যাপারেও দল আশাবাদী।

গত ২০০১ ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাদারিহাটে জোট বেঁধে লড়াই করেছিল কংগ্রেস ও তৃণমূল। কিন্তু ২০০৬-এ তৃণমূল বিজেপি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় একা লড়ে কংগ্রেস ছিল দ্বিতীয় আসনে। আবার ২০০৯-এর লোকসভা এবং ২০১১-র বিধানসভায় তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে মাদারিহাট বিধানসভাতে কংগ্রেস-তৃণমূল চলে যায় তৃতীয় স্থানে। ভোট পরিসংখ্যানের এই অঙ্ক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই কেন্দ্রটিতে এখনও বিজেপি বাম, তৃণমূল ও কংগ্রেসের থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনেও মাদারিহাটে বাম-প্রার্থী বিজেপি-র থেকে তেইশ হাজারেরও বেশি ভোটে পিছিয়ে ছিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, একা লড়লেও বিজেপি এখানে বাম- কংগ্রেস জোট এবং শাসকদলকে বেগ দিতে যথেষ্টই শক্তিধর। সেই অবস্থার সুযোগ নিয়েই বিজেপি এবার যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাতে উদ্‌বেগ বাড়ছে শাসকদল থেকে শুরু করে বাম এবং কংগ্রেসেরও। বিজেপি-র এই শক্তি বৃদ্ধিতে নরেন্দ্র মোদির সভা সহায়ক তো হবেই, অন্য দিকে শাসকদল ও বামেদের কপালে চিন্তার রেখা আরও কয়েকটি বাড়িয়ে দেবে। তার সঙ্গে নেপালি ও হিন্দি ভাষীদের ভোট ব্যাঙ্ক যে গেরুয়া শিবিরকেই সমর্থন করবে, তাতেও সন্দেহ নেই।

এবার ডুয়ার্সের নেপালি ভাষীদের ভোট কি জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠবে?

ডুয়ার্সের চা-বাগান অধ্যুষিত নির্বাচনক্ষেত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশ বাগানেই নেপালি ভাষার মানুষ রয়েছেন। সংখ্যায় তাঁরা অধিকাংশ বাগানেই সংখ্যালঘু, তবে কোথাও আদিবাসীদের তুলনায় সামান্য হলেও বেশি। আলোচনা প্রসঙ্গে চলে আসে চা-বাগান অধ্যুষিত নির্বাচনী ক্ষেত্র নাগরাকাটা। এখানে মোট ভোটার প্রায় ২ লক্ষ ১১ হাজার। এবার এই কেন্দ্রের লড়াই হচ্ছে চতুর্মুখী। এই লড়াইতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন এই কেন্দ্রে থাকা নেপালি ভাষী ভোটাররা। পরিসংখ্যান এ কথাই জানায় যে, এই কেন্দ্রে বর্তমানে নেপালি ভাষী ভোটারের শতকরা হার ২১ শতাংশ। সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না যে, এই সংখ্যাটি এবার ভোটের ফলাফলে একটা বড় ফ্যাক্টর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদেরও ধারণা সেটাই।

একটা সময় এই বিরাট সংখ্যক নেপালি ভাষী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করত সিপিএম। সামসিং, মহাবাড়ি, নিউ খোনিয়া, মালঝোরা, আমবাড়ি, চামুর্চি ইত্যাদি এলাকায় গত ৩৪ বছর লাল পতাকাই উড়েছে। কিন্তু ছবিটা বদলে গেল ২০০৮ সালে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলন শুরু হওয়ার ঠিক পরের মুহূর্তেই। আচমকাই যেন লাল দুর্গ কেঁপে উঠল। তারপরেই নামল ধস। ওই নেপালি ভাষী এলাকার প্রায় প্রতিটি অলিগলিতেই লাল পতাকার জায়গায় দেখা গেল মোর্চার পতাকা। শুধু তা-ই নয়, বিমল গুরুঙের ছবিও ঝুলতে দেখা গেল ঘরে-বাইরে সর্বত্র।

২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে পরোক্ষে সমর্থন দিলেন বিমল গুরুং। সেবার তো জোট ছিল কংগ্রেস আর তৃণমূলের। জোটের প্রার্থী ছিলেন জোসেফ মুন্ডা। নেপালি ভোটারদের গরিষ্ঠ অংশই সমর্থন দিলেন জোটকে। বিধায়ক হলেন জোসেফ মুন্ডা। তার পরের ইতিহাস তো সবারই জানা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের একাধিপত্য নষ্ট হয়। তবে বিজেপি-রও প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ২০১৪ সালের এই বিধানসভা কেন্দ্রে ১ নম্বরে উঠে আসে বিজেপি। তারপরও কেটে যায় দু'বছর। কিন্তু এবারের হিসেব অন্য অঙ্কে। এবারের প্রার্থী জন বারলা। এক সময় মোর্চার তীব্র বিরোধী বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় রাজনৈতিক সব সমীকরণই যে বদলে যায় তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

যদিও তৃণমূল এসব ব্যাখ্যা মানে না। নাগরাকাটার ব্লক সভাপতি অমরনাথ ঝা সাফ জানিয়ে দিলেন, ভোট হয় উন্নয়নের ভিত্তিতে, জাতপাতের প্রশ্ন ওঠেই না। গত কয়েক বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই এলাকার জন্য কী কাজ করেছেন, তার ফিরিস্তি ১৬ মার্চ জনসভায় নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। 'পার্টি ভন্দা জাতি তুলো'— এক সময় নেপালি ভাষীদের এই স্লোগান গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। সেরকম কিছু হলে নাগরাকাটা কেন্দ্রে সব হিসেব কি পালটে দিতে পারেন না নেপালি ভাষী ভোটাররা? অন্য দিকে, কালচিনি ব্লকের নেপালি ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে কিন্তু চিন্তিত শাসকদল। সেখানে শাসকদলের তরফে টিকিট পেয়েছেন এলাকার বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারি। গত ২০১১-তে তিনি ছিলেন মোর্চা সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। ভোটে জিতে শাসকদল তৃণমূলে যোগ দেন। এই জয়ে উইলসনের পক্ষে ছিল মোর্চার ভোট ব্যাঙ্ক। ফলত মোর্চার কাছে সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত উইলসন হলেন বিশ্বাসঘাতক। ফলে এবার নেপালি ভোট ব্যাঙ্ক উইলসনকে যে সমর্থন দেবে না, সে কথা ধরেই নেওয়া যায়। কারণ, মোর্চা বিজেপি-কেই সমর্থন করবে কালচিনিতে।

আলিপুরদুয়ারের সীমান্ত ব্লক কালচিনি অনেকটাই বদলে গিয়েছে গত পাঁচ বছরে। চন্দন কাঠ বিতর্কও উইলসনের ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছে বেশ খানিকটা। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উইলসন এখন চিন্তিত এই নেপালি ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে। যদিও উইলসন বললেন, 'এবার আর কালচিনিতে জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে ভোট হবে না।' প্রশ্ন, জাতপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নেপালি সম্প্রদায় আচমকা উন্নয়নকেই আঁকড়ে ধরবে কেন? তা কি সমতলে মোর্চার কোমড় ভেঙে গিয়েছে বলে? অন্য দিকে, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পবন লাকড়ার সঙ্গে কথা বলে কিন্তু শাসকদল যে নেপালি ভোট নিয়ে উদ্‌বিগ্ন, সে কথা স্পষ্টই বোঝা গেল। কারণ, তিনি নেপালি ভোট যে বড় ফ্যাক্টর এই কেন্দ্রে ভোট জেতার ক্ষেত্রে, তা একরকম মেনেই নিলেন। যদিও তিনি উন্নয়নের রাজনীতিকে সামনে আনতে চাইলেন জাতপাতের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে। তবে মোর্চা এই কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়নি কোনও লাভ হবে না জেনেই। কিন্তু বিজেপি প্রার্থীকে কালচিনি কেন্দ্রে নেপালি ভাষী মানুষদের ২১ শতাংশ ভোট পেতেও বেগ পেতে হবে। এক তো এখানে তাঁদের কোনও সংগঠনই নেই। কোনও নেতা-কর্মীকে এখানে ভোট নিয়ে ছোটাছুটি করতেও দেখা গেল না।

বিজেপি-র পক্ষে আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকে বিপুল সম্ভাবনার কারণেই যে উদ্যোগ, তা কালচিনিতে নজরে পড়েনি। শুধু নেপালি ভোট ব্যাঙ্ক নির্ভর করে হয়ত নির্বাচনের বৈতরণি পার হওয়া যায় না, কিন্তু ওই ভোট যে এই কেন্দ্রে একটি বড় ফ্যাক্টর তা এক বাক্যেই মেনে নিচ্ছেন শাসক ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা।

উন্নয়ন নেই তাই বুথমুখী না হওয়ার হুঁশিয়ারি উত্তর জুড়ে

ভোট আসে, ভোট যায়। প্রতিশ্রুতির বন্যা ছোটে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই বদলায় না। বঞ্চনা আর অবহেলা কিছুতেই যেন পিছু ছাড়ে না ডুয়ার্সের। প্রতিবারই ভোটের সময় প্রার্থী আসেন স্থানীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে। গ্রামের মানুষের সামনে দাঁড়ান হাত জোড় করে। হাসি হাসি মুখে গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ গলাধঃকরণ করে নিশ্চিত সমাধানের কথা দেন। কিন্তু তারপর? যে-কে-সে-ই অবস্থায় নাকাল হন স্থানীয় মানুষ। কিন্তু এবার আর তেমনটা হতে দিতে চাইছেন না ডুয়ার্সের আম আদমি।

নোটার হাওয়া বনবস্তিতে

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার— এই তিনটি জেলায় বনবস্তির সংখ্যা ২৫০-রও বেশি। তাঁদের অধিকাংশই কি এই বিধানসভা নির্বাচনে 'না-ভোট' বা 'নোটা'য় বোতাম টিপছেন? বন-জন শ্রমজীবী আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল জানান যে, তাঁরা দার্জিলিং থেকে কুমারগ্রাম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জঙ্গলবাসীদের প্রতি এবার 'নোটা'য় ভোট দেবার আহ্বান জানাচ্ছেন। কেন এই আহ্বান?

২০০৬ সালে লোকসভায় পাশ হয়েছিল বন অধিকার আইন। এই আইনের মূল কথা হল, জঙ্গলে বসবাসকারী বনবস্তির মানুষকে তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চের অভিযোগ, বন দপ্তর কিছুতেই এই আইন মানতে রাজি নয়। তারা আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করছে, এমনকি মঞ্চের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও করছে। বন দপ্তর যদিও ওই অভিযোগ মানতে নারাজ। এমত পরিস্থিতিতে গত বছর থেকে শুরু হয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে বনবস্তি ভূমি সমীক্ষার কাজ।

বনবস্তিবাসীর সংগঠন বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চের অভিযোগ, গোটা সমীক্ষা পদ্ধতিতে বেআইনিভাবে 'নাক গলাচ্ছে' বন দপ্তর। এর ফলে জমি কমে যাচ্ছে গ্রামের মানুষের। শুধু তা-ই নয়, কোনও কোনও জায়গায় সর্বজনীন ব্যবহার্য জমিগুলোও বেমালুম লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বনাধিকারিক আইন মেনে সেখানকার বনবাসী বাসিন্দাদের জমির অধিকার, বনসম্পদের অধিকার দেওয়ার কথা। কিন্তু বনবস্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে বন দপ্তর বাধা দিচ্ছে। বনবস্তিগুলি 'রেভিনিউ ভিলেজ'-এ পরিবর্তিত হওয়ার কাজ শুরু হলেও সিংহভাগ ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয়নি। কোনও বৈধ সমীক্ষা ছাড়াই কিছু ক্ষেত্রে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে, যা দেওয়ার নিয়ম নেই।

রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়ে একেবারে চুপচাপ বলেও বনবাসীদের অভিযোগ। অথচ ভোটের সময় তাদের মুখে প্রতিশ্রুতির বান ডাকে। লালসিংহ ভুজেলের কথায়, '২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল আশ্বাস দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে রাজ্যে এই সমস্যা সমাধান করতে তারা ভূমিকা নেবে। ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের আগেও আরেক দফায় তৃণমূল, বিজেপি, বাম শরিক বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের সঙ্গে তারা কথা বলে। কেউই কিছু করেনি।'

এর ফলাফল কী হতে পারে? একদিক থেকে দেখলে বনবস্তিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাটা এতটাই কম যে, বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের মতো বৃহৎ ক্ষেত্রে সেখানকার ভোটটি বলতে গেলে হিসেবেই আসে না। তবে এবারের নির্বাচনটিতে যে অনেক আসনেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, সে বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিত। দুই-আড়াই হাজার ভোটে জয়-পরাজয়ের নির্ধারণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়টি মাথায় রাখলে উত্তরবঙ্গ বন-জন শ্রমজীবী মঞ্চের নোটায় ভোট দেওয়ার আহ্বানকে সত্যিই অবহেলা করা যায় কি?

জবাব না-ভোটে

সীমান্তবর্তী গ্রাম লোথামারি। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৭ নম্বর জনপদ। গ্রামটি শুধু বাংলাদেশের সীমানা ঘেঁষেই নয়, কাঁটাতারের বেড়াতেও ঘেরা। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না রেখেই সেখানে কাঁটাতার পড়েছে। আর সেই বেড়ার কারণেই লোথামারির বাসিন্দারা নিজভূমে পরবাসী। ভোটপ্রার্থীরা ভোট চাইতে এসে দেখেছেন কাঁটাতারের বেড়া ডিঙানো কত বিড়ম্বনা। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই গ্রামের চেহারায়। গ্রামবাসীরা সব মিলিয়ে দু'শোর সামান্য কিছু বেশি। সবাই দারিদ্রসীমা ছুঁয়েই রয়েছেন। গ্রামবাসীদেরই প্রথম অভিযোগ, জীবনভর সমস্যা তাঁদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যাতায়াত থেকে শুরু করে সবরকম চলাফেরাতেই বিএসএফ-এর কাছে পরিচয়পত্র জমা রাখতে হয়। অন্য সময় সীমান্তের গেট বন্ধ থাকায় মূল ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। সন্ধের পর তো জেলখানার কয়েদিদের মতো বন্দি জীবনযাপন। এ ছাড়া পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা, রাস্তাঘাট, সেচ কিছুই নেই এখানে। মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে শুরু করে বিডিও— সবার কাছেই সমস্যার কথা জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু তাঁরা আন্তর্জাতিক সমস্যা— এই অছিলায় গভীরে ঢুকতে চান না। মোট কথা, তাঁদের সমস্যার সমাধানে আগ্রহী নয় কেউ। কিন্তু প্রার্থীরা আসছেন ভোট চাইতে। কিন্তু গ্রামবাসীরা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অভিমত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভুলের খেসারত এতকাল ধরে যে মানুষরা দিয়ে এসেছেন, তার জবাব এবার তাঁরা দিতে চান ভোট না দিয়ে।

প্রতিশ্রুতি শুনতে নারাজ

সীমান্ত-ঘেঁষা গ্রাম থেকে কোচবিহার শহর পেরিয়ে শামুকতলা। সেখান থেকে তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতে দামসিবাদ, শিরকাঁটা, মঙ্গলহাট, কুড়িমাইল প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দাদের মুখেও শোনা গেল ভোট বয়কটের ডাক। এখানে সংখ্যাটা আর দু'-চারশোয় আটকে নেই। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০০০। পরিস্থিতিটা এখানে জটিল নয় ঠিকই, তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, হাটবাজার, এমনকি যাবতীয় সরকারি অফিসকাছারি— সবই তুরতুরি নদীর ওপারে। ফলে সারা বছরই গ্রামের হাজার হাজার মানুষকে পেরতে হয় সেই নদী। কিন্তু পারাপারের ব্যবস্থাটা কী? এলাকাবাসীদের ভরসা প্রায় ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটা বাঁশের সাঁকো। বর্ষা না থাকলে সেটা পেরনো যায় কোনওরকমে, কিন্তু বৃষ্টির দিন বা ভরা বর্ষায় ওই সাঁকো থাকে জলের নিচে। তখন কার্যত গ্রামেই বন্দি থাকতে হয় বাসিন্দাদের। বিকল্প পথ হিসেবে তখন চা-বাগান, এমনকি বক্সা বাঘবনের গভীর জঙ্গলপথকেই বেছে নিতে হয়। শহর ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাতে তখন এ ছাড়া আর কোনও উপায়ান্তর থাকে না। এমনকি রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছাতেও ওই ঘুর ও দীর্ঘ পথ পেরিয়েই যেতে হয়। স্কুল-কলেজ থেকে চাকরি, ব্যবসা, এমনকি চিকিৎসার জন্য যোগাযোগের সমস্যায় জেরবার তুরতুরিসহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ একাধিক গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। বিগত ২২-২৪ বছর ধরে এই মানুষরাই তুরতুরি নদীর উপর একটি পাকা সেতুর দাবি জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু কী পেয়েছেন তাঁরা? প্রশাসন থেকে শুরু করে শাসকদলের নেতারা নানা সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আজও পাকা সেতু নির্মাণের কোনও উদ্যোগই নজরে আসেনি বাসিন্দাদের। সেতু নির্মাণের দাবি এত বছর ধরে উপেক্ষিত থাকায় আজ ক্ষোভে ফুঁসে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই আসন্ন ভোটে প্রত্যাশাপূরণ না হওয়ার ক্ষোভ জানাতে বদ্ধপরিকর গ্রামবাসীরা বুথমুখো হবেন না— এমন সিদ্ধান্তে অটল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, হলদিবাড়ি রোডকে মাঝবরাবর ভাগ করেছে তুরতুরি নদী। সেই নদী পেরিয়ে হাতিবাড়ি রোড এসে মিশেছে শামুকতলা-হাতিপোতা রাজ্য সড়কে। বছরের পর বছর যাতায়াতের নিদারুণ সমস্যায় নাকাল হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। অথচ ব্লক প্রশাসন, জেলা পরিষদের কর্তারা উদাসীন। পাকা সেতু নির্মাণের দাবিতে যতবারই আবেদন উঠেছে, তার থেকেও বেশি মিলেছে প্রতিশ্রুতি। কখনও কখনও এমনটাও বলা হয়েছে, প্রায় দু'কোটি টাকা খরচ করে সেতু নির্মাণের প্রকল্প মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। কাজ শুরু হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু এমন কথা গত বিশ বছরে যতবার শোনা গিয়েছে, তার এক বিন্দু উদ্যোগ আজও লক্ষ করা যায়নি। এলাকার বাসিন্দা বিজয় কার্জি বললেন, 'জন্ম থেকে দামসিবাদ গ্রামেই আছি। দুই জমানাই চোখে দেখলাম। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও শুনলাম। এবার ভোট বয়কট করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।' নাম বলতে অনিচ্ছুক এক জনৈক গ্রামবাসীর মুখে জানা গেল, ২০১৪ সালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে তুরতুরি নদীর উপর ফিতে ফেলে অনেক মাপজোক করলেন। তারপর হল মাটি পরীক্ষা। এর পর শোনা গেল, ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অনেক প্রকল্প আর টাকার গল্প শুনেছেন সে গ্রামের মানুষ। গল্প কথা শুনতে আর রাজি নন তাঁরা। তাই ভোট দেওয়া তো দূর অস্ত, বুথেই যেতে চাইছেন না। প্রবীণ গ্রামবাসী মহেশ নার্জিনারি বললেন, 'এক সময় তো আমরাই চাঁদা তুলে সেতু তৈরি করার দরখাস্ত করেছিলাম জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে। সেটাও মানতে রাজি নয় তারা। তখনও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি।' গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রবেন বসুমাতা মানলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নদী পারাপার করে স্কুল-কলেজ করে। সারা বছর নদীতে হাঁটুজল থাকায় রোগীদের কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ঠিক বুঝতে পারি না, কী কারণে এই বঞ্চনা আর উপেক্ষা।' আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ সভাপতি মোহন শর্মার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনিও ভোটের ব্যস্ততার অজুহাত শোনালেন। একই ব্যস্ততায় 'খোঁজ নিয়ে জানতে হবে' বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতিও।

ভোটে নারাজ জনজাতি গ্রাম

অনুন্নয়ন ও বঞ্চনাকে হাতিয়ার করে ভোট বয়কটের ডাক শোনা গেল ধূপগুড়ি কেন্দ্রের খুটিমারি জঙ্গলের খুকলুং ও গোঁসাইহাট বনবস্তির রাভা জনজাতির মুখেও। ঘটনাচক্রে মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে হাজির। এই দুই বস্তিতে সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫০০ মানুষের বসবাস। তার মধ্যে ভোটার হলেন ১২০০। রাভা জনজাতির মানুষ ছাড়াও খুকলুং বস্তিতে রয়েছে ২২ ঘর আদিবাসী। দরিদ্রতার মধ্যে দিন গুজরান করা ওইসব মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতজন বিপিএল তালিকাভুক্ত। এলাকায় দু'টি প্রাথমিক স্কুল থাকলেও শিক্ষকের অভাবে সেগুলি প্রায় অচল অবস্থাতেই রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাও বেহাল। বনবস্তি মানুষদের চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ১৬ কিলোমিটার দূরে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। বছর চারেক আগে এলাকায় একটি পাকা রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি। কিন্তু যাতায়াতের পথ এখনও বেহাল। বর্ষায় সেসব পথঘাটের অবস্থা কী হয় তা চোখে না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয়। এলাকায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের

ছাত্রছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নদী পারাপার করে স্কুল-কলেজ করে। সারা বছর নদীতে হাঁটুজল থাকায় রোগীদের কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ঠিক বুঝতে পারি না, কী কারণে এই বঞ্চনা আর উপেক্ষা। তাই গ্রামবাসীরা এবার কারও কোনও প্রতিশ্রুতিতেই আর ভুলতে রাজি নয়। তাদের সাফ কথা, সেতু নির্মাণ না হলে তারা বুথমুখোই হবেন না।

বনবস্তির প্রায় হাজার তিনেক মানুষ ভোট বয়কটের দাবিতে মিছিল করে। এলাকার বিভিন্ন বাড়িঘরের দেয়ালে ভোট বয়কটের পোস্টারও চোখে পড়ে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা সে মিছিলে নেতৃত্ব দিলেও সিপিএম, বিজেপি-সহ অন্যান্য দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

কোনও কর্মসংস্থান নেই। বন দপ্তরের ন'মাসে-ছ'মাসের প্রকল্পের কাজের উপরেই নির্ভর করতে হয় তাদের। কৃষিকাজই রাভাদের এখন জীবনধারণের একমাত্র উপায় হলেও এখানে সেচব্যবস্থা সেই মান্ধাতার আমলে। বহু জায়গাতেই অমিল পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা। বহুদিন ধরেই রাভা জনজাতির মানুষ তাঁদের জীবনের সমস্যার কথা জানিয়ে এসেছেন প্রশাসনকে। কখনও কখনও নেতা-মন্ত্রীদেরও দ্বারস্থ হয়েছে, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি। সুল টুং সেতুর উপর দাঁড়িয়ে রাভা জনজাতির সংস্কৃতির প্রতিনিধি গনাদ রাভা, রাভা বনবস্তির ১০৮ বছর বয়সি দীপচাঁদ রাভা, পশুরাম ও ইশিং রাভার থেকে জানা গেল এ ধরনের অভিযোগ। এর পরই ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভ্য মালতী শৈব্য রাভা, শাসকদলের এক নেতা ভবেন রাভা এবং রাভা উন্নয়ন পর্ষদের আরেক নেতা রবি রাভার নেতৃত্বে খুকলুং ও খুটিমারি রাভা বনবস্তির প্রায় হাজার তিনেক মানুষ ভোট বয়কটের দাবিতে মিছিল করে। এলাকার বিভিন্ন বাড়িঘরের দেয়ালে ভোট বয়কটের পোস্টারও চোখে পড়ে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা সে মিছিলে নেতৃত্ব দিলেও সিপিএম, বিজেপি-সহ অন্যান্য দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মুখেই জানা, বনবস্তি এলাকার মানুষের উন্নয়ন কোনও জমানাতেই ঠিক ঠিকভাবে হয়নি। তাই এই বঞ্চনার জবাব দিতেই দলমত নির্বিশেষে এই মিছিল এবং ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত। জানা যায়নি উত্তরবঙ্গে বসে মুখ্যমন্ত্রীর কানে পোস্টার, ব্যানার-সহ তাঁরই দলের নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে ভোট বয়কটের এমন মিছিলের খবর পৌঁছেছিল কি না। তবে এই ঘটনার ঠিক পরের দিনই ধূপগুড়ি চূড়াভাণ্ডারে মুখ্যমন্ত্রীর ভোট প্রচার সভা ছিল। সেখানে তাঁর বক্তব্যে কিন্তু কোনওভাবেই এই ঘটনার আঁচ মেলেনি। ধূপগুড়ির বিডিও শুভংকর রায়ের সঙ্গে খুটিমারি ও খুকলুং বস্তি রাভা জনজাতির ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। তবে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত যে রাভা জনজাতির বঞ্চনা এবং উপেক্ষার জেরেই নিয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে চাইলেন না।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না

ভোট বয়কটের কথা শোনা গেল, কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি গ্রামে। এখানে সমস্যাটা একটু ভিন্ন। গ্রামবাসীরা বঞ্চনা বা উপেক্ষার ক্ষোভ সেভাবে উচ্চারণ করলেন না ঠিকই, তবে বর্ষায় নদী ভাঙনের আতঙ্ক যে তাদের ঘুম কেড়ে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাতে দ্বিধা করলেন না। বোঝা গেল, ভাঙন রোধে প্রশাসনের তৎপরতা যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের মুখে শোনা যায় নদী ভাঙন মোকাবিলা বিষয়ের নানা প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে প্রতিশ্রুতিগুলি ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়। কুমারগ্রাম ব্লকের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে সংকোশ, রায়ডাক, তুরতুরি, জয়ন্তিসহ আরও বেশ কয়েকটি খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। ভরা নদীর স্রোত ফি-বছর বর্ষার সময় গিলে নেয় বসতবাড়ি, আবাদি জমি, চা-বাগান ও বনভূমি। ঘরবাড়ি হারিয়ে যেসব মানুষ নদীর ধারে বসবাস করছেন, আজ তাঁরা সর্বস্বান্ত। আবাদি জমি হারিয়ে অনেকেই আজ দিনমজুর। বহু মানুষ চলে গিয়েছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কাজের আশায়। নদীর ধারে এখনও যাঁরা মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, তাঁরা কিন্তু অন্য বঞ্চনার থেকেও নদী ভাঙন ইস্যুতেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। অভিযোগ তুললেন স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। বাদ রাখেননি প্রশাসনের উদাসীন ভূমিকা নিয়ে। ভোটের ঠিক আগে যখন এই অঞ্চলে প্রচার একটু একটু করে জমে উঠেছে, তখন নদীতীরবর্তী মানুষদের ক্ষোভের পারদ চড়ে উঠেছে অনেক উপরে। কারও কারও মুখের ভাষায় ভোট বয়কটের কথাও শোনা গেল। এক কথায়, ভোট বয়কট করার আগাম আভাস পাওয়া গেল কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ, রায়ডাক, তুরতুরি, জয়ন্তি নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষের মুখে।

মাইনে বাড়লে তবেই ভোট

কোনও আভাস বা ইঙ্গিত নয়, সরাসরি এবং স্পষ্ট ভাষায় ভোট বয়কটের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন জলপাইগুড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকারা। সাম্মানিক বৃদ্ধির ইস্যুকে সামনে এনে আসন্ন বিধানসভা ভোট বয়কটের ডাকে 'অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা বাঁচাও কমিটি' মিছিল করলেন খোদ জলপাইগুড়ি শহরের বুকে। গত ১৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী যখন ডুয়ার্সে ভোট প্রচার জনসভায় তাঁর সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরছেন, ঠিক সেই সময় জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ায় কয়েক হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা মিছিলে হাঁটলেন তাঁদের সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবিতে এবং ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে। এর আগেও জলপাইগুড়ি শহরে তাঁরা পোস্টার, ব্যানার নিয়ে মিছিল করেছেন। কিন্তু ভোটের আগে এ ধরনের মিছিল এবং প্রকাশ্যে ভোট বয়কটের ডাক শুনেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। আর তাতেই ক্ষোভ বেড়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। 'অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা বাঁচাও কমিটি'র পক্ষে টুম্পা বালো জানান, জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ১০০০০ কর্মী-সহায়িকা রয়েছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কাজ করার পরও গত পাঁচ বছরে তাঁদের সাম্মানিক বাড়েনি এক পয়সাও। সাম্মানিক বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁরা এর আগে বহুবার আবেদন করেছেন। ফল না পেয়েই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

জল দিলে ভোট, না হলে ফোট

শুধুমাত্র পানীয় জলের ইস্যুকে সামনে রেখে ভোট বয়কটের ডাক জোরদার হয়ে উঠছে ডুয়ার্সের কোনও কোনও অঞ্চলে। শুনলে অবাক হতে হয়, অথচ স্বাধীনতার এত বছর পরেও যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হতে হয় কোনও গ্রামবাসীকে। তাহলে ক্ষোভ বা বিক্ষোভে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কি খুব গর্হিত কাজ হবে? সে বিচারের দায় গা থেকে ঝেড়ে ফেলে তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের মহিষ লুচি অঞ্চলের কয়েক হাজার বাসিন্দা ভোট বয়কটের ডাকে পৌঁছাবেন বলে জানালেন। একই কথা জানালেন শালডাঙা, ঘোনাপাড়া, পালিকা, কেদারচরসহ আরও বহু গ্রামের বাসিন্দারা। বক্সিরহাট বাজার থেকে মহিষ লুচি এক নম্বর অঞ্চল এবং গ্রাম তথা বুথগুলির দূরত্ব প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার। গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা অপরিষ্কার নলকূপের জল পান করছেন একরকম বাধ্য হয়েই। আর প্রায়শই পেটের রোগ অথবা জলবাহিত রোগে ভুগছেন। জল ফুটিয়ে পান করার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। এমনকি যেসব পরিবারে শিশু রয়েছে, তারাও। এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দার দাবি, মহিষ লুচি ১ নম্বর অঞ্চলে আগে নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হোক, তারপর বুথে যাওয়া এবং ভোটদানের প্রসঙ্গ। তা না হলে বুথমুখোই হবেন না তাঁরা। অন্য দিকে, জল যার, ভোট তার— এমন স্লোগান তুলেছেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নাগরাকাটার লুকসান

WRAP YOURSELF IN DARJEELING

Even on the coldest day, this hill station will embrace you in its warmth. From the steaming cups of tea to the smiles that greet you on its sloping paths, everything will wrap you up in a blanket of sweetness.

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb www.twitter.com/TourismBengal (033) 2243 6440, 2248 8271

চা-বাগানের প্রায় ৭০০০ মানুষ। ভুটান সীমান্তের লুকসান বাগান এলাকায় পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার হাজার হাজার মানুষ। চৈত্রের শুরুতেই এই এলাকার সমস্ত কুয়ো যায় শুকিয়ে। তখন ভরসা একমাত্র পাহাড়ি ঝোরা ও নালার জল। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে লুকসান চা-বাগানের বৃহত্তর এলাকাটি চড়াই-উতরাইয়ে ভরা। জলসংকট শুরু হয় অপেক্ষাকৃত উঁচু ঢালে অবস্থিত শ্রমিক মহল্লাগুলিতে। ক্রমে সেই সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। অস্বাভাবিক হারে জলস্তর নেমে যাওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের টিউবওয়েলগুলি থেকে আর কিছুতেই জল মেলে না। বহুবার হাতল পাম্প করার পর যেটুকু মেলে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এই অবস্থায় ভরসা পাহাড়ি ঝোরা ও ডায়না নদীর জল। কিন্তু সে জলও ডলোমাইট নয়। লুকসান চা-বাগানের প্রতিটি শ্রমিক মহল্লাতে জলসংকটের এই করুণ দৃশ্য ফিরে ফিরে আসে প্রতি শুখা মরশুমে। ফেব্রুয়ারি মাস পড়তেই শুরু হয় এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার। তাই লুকসান চা-বাগান এবং গাঠিয়া চা-বাগানসহ এলাকার সমস্ত স্তরের মানুষ এবার আওয়াজ তুলেছেন, 'জল যে দেবে, তাকেই ভোট'। কিন্তু শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে কাজ চলবে না। রীতিমতো লিখিতভাবে জানাতে হবে। তবেই তাঁরা বুথে যাবেন, তা না হলে এবার ভোট পাবেন না কোনও প্রার্থী। সোমরা মুন্ডা, বিকাশ ওঁরাও, গঙ্গা ওঁরাও, কেরবিন কাছোয়া, সুনা ছেত্রী-সহ আরও বহু চা-বাগান শ্রমিকদের জলের হাহাকার নিয়ে ভোট বয়কটের এই সিদ্ধান্তের কথা চা-বাগান ম্যানেজার অনিন্দ্য বাগচিকে জানাতে বললেন, 'জলসংকট বাস্তব সত্য। তবে সে সমস্যা এড়াতে কিছুই যে করা হয়নি এমনটাও নয়।' তাহলে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত কি স্রেফ হঠকারিতা? 'না, ঠিক তা নয়। তবে...।'

ভোট না দেওয়ার ডাক দিনাজপুর-মালদায়

অনুন্নয়ন আর অবহেলার জেরে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, আর তারই জেরে ভোট বয়কট করার ডাক শুধু ডুয়ার্সেই আটকে নেই। তার ছোঁয়া যেন লেগেছে গোটা উত্তরবঙ্গে। সেখানেও জেলার বিভিন্ন ব্লক তথা গ্রামের মানুষ বঞ্চনা আর অবহেলার শিকার। দীর্ঘদিন প্রশাসনের প্রায় সব স্তরেই তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে কোনও ফল মেলেনি। এই না-পাওয়া থেকেই ক্ষোভ জমতে জমতে আজ বিরাট আকার ধারণ করেছে। উপেক্ষিত এবং অবহেলিত মানুষ ভোটের প্রাক-মুহূর্তকে মনে করেছেন জেহাদ ঘোষণার উপযুক্ত সময়। আর সেই জেহাদের হাতিয়ার হল ভোট বুথে না যাওয়া এবং কোনও প্রার্থীকেই ভোট না দেওয়া। ডুয়ার্স থেকে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকেও দেখা গেল একই চিত্র। সেখানকার সহজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম মালকাহার। এই আদিবাসী গ্রামটির প্রতিটি ঘর নজর কাড়ে দেয়ালে সাঁটা পোস্টারগুলির জন্য। পোস্টারে লিখে রাখা আছে— বিশুদ্ধ পানীয় জল চাই, প্রতিটি বাড়িতে চাই শৌচালয়, তা না হলে একটিও ভোট নয়। নিজেদের দাবি পূরণ করতে ভোট বয়কটের ডাক নতুন নয়। প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবিদাওয়া পূরণ করার এক বিরাট হাতিয়ার হল ভোট বয়কট। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মানুষ নিজেই হাতিয়ার করে তুলতে পারে। আর তা যদি প্রশাসন কিংবা রাজনৈতিক দল তথা নেতা-নেত্রীদের উদ্‌বেগের কারণ হয়, তাহলে একদিকে গণতন্ত্র অবমাননার দায় বর্তায় সমগ্র রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর। হয়ত সে কারণেই প্রত্যাশাপূরণ না-হওয়া, ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া মানুষ ভোট বয়কটকেই বেছে নিয়েছেন তাঁদের আন্দোলনের এবং বিদ্রোহের পথ হিসেবে। মালকাহার গ্রামের কয়েকশো আদিবাসীও দীর্ঘদিন পানীয় জল ও শৌচালয়ের অভাবের কথা জানিয়ে কোনও ফল পাননি। তাই বাধ্য হয়েই ভোট বয়কটের পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে কোনওমতে দিন গুজরান হয় এইসব মানুষের। সবিতা টুডু, লক্ষ্মী কিসপু, শ্রীমতী মার্ডি এমন বহু আদিবাসীর মুখে জানা গেল, তাঁদের উন্নয়ন নিয়ে ভাববার মতো কেউ নেই। নেতা-কর্মীরা প্রচারে এর আগেও এসেছেন, প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন, কিন্তু তা আসলে মিথ্যে। গ্রামে নেই ইন্দিরা আবাসের ঘর, গ্রামের বয়স্কদের জন্য বার্ধক্য ভাতারও ব্যবস্থা নেই, গ্রামে পানীয় জলের জন্য একটিই মাত্র টিউবওয়েল। তাও ব্যবহারের অযোগ্য। গ্রামের সমস্ত পুরুষ-নারীকেই বাধ্য হয়ে শৌচকর্ম করতে যেতে হয় মাঠে-ঘাটে। এর পরও তাঁদের শুনতে হয় উন্নয়নের লম্বা ফিরিস্তি। এবার কিন্তু তাঁরা আর শুনতে রাজি নন মিথ্যে কোনও প্রতিশ্রুতি। আর সেই কারণেই তাঁদের সিদ্ধান্ত, আগে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা, তারপর বুথ পর্যন্ত পৌঁছানো। কোনও মূল্যেই এবার আর তাঁরা কারও প্রতিশ্রুতিতেই ভোট দিতে যাবেন না।

ব্রিজ দাও, তবেই ভোট

শাসকদল হোক কিংবা বিরোধী, যারাই ভোট চাইতে আসুক না কেন, যত উন্নয়নের কথাই বলুক না কেন, প্রতিশ্রুতি তাদের মুখে যতই ফুটুক না কেন, স্পষ্ট করেই তাদের ফিরিয়ে দেবেন ভোটাররা। শুধু তা-ই নয়, জানিয়ে দেওয়া হবে, সারা গ্রাম জুড়ে বঞ্চনা আর অবহেলার জেরে যে পোস্টার পড়েছে, তার এক বর্ণ মিথ্যে নয়। মূল দাবি রতুয়া নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ। যে দাবি গত কয়েক দশক ধরে গ্রামবাসীরা জানিয়ে আসছেন। অথচ তা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। ঘটনাস্থল ইসলামপুর বিধানসভা এলাকার মাটিকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এখানে পোস্টার পড়েছে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে। সে পোস্টারগুলি কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, সংগঠনেরও নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে লেখা সেই পোস্টার কিন্তু রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, প্রশাসন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। জানা গেল, মাটিকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের জগতাগাঁ সংলগ্ন বয়ে যাওয়া রতুয়া নদী গ্রীষ্মে শুকিয়ে গেলেও সামান্য বর্ষাতেও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। নদীর ওপারে রয়েছে খিকিরডাঙ্গি, মরিচবাড়ি, হাটখোলা, বারোঢালি, বালাভিটা, বারোঘরিয়া, চাউন্দি এমন আরও বহু গ্রাম। এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য নদীর উপর ছিল একটি কাঠের ব্রিজ। সেটিও বহুকাল হল ভেঙে গিয়েছে। এখন আর তা মোটেও ব্যবহারযোগ্য নয়। অথচ গ্রামবাসীদের ইসলামপুরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা ওই কাঠের ব্রিজ। ভাঙা ব্রিজ সারাই না হলে অথবা নতুন ব্রিজ তৈরি না হলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী হয়ে পড়বেন। তাই যতক্ষণ না ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ ভোট দেওয়ার কথা ভাবতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে গ্রামবাসীরা ওই দাবি জানিয়ে আসছেন। ভোটের সময় ফি-বছর সবাই এসে আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট চলে গেলে আর তাঁদের দেখা মেলে না। গ্রামবাসীরা অনেকবারই নিজেরা চাঁদা তুলে ব্রিজ মেরামতি করেছিলেন। কিন্তু এখন আর সেটা সারাইয়ের পর্যায়ে নেই।

পোস্টারে শ্লোগানে ভোট বয়কট

'আগে রাস্তা, পরে ভোট'— এমন দাবি নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন মালদার মানিকচক বিধানসভার কয়েক হাজার ভোটার। বিক্ষুব্ধ ভোটারদের পক্ষ থেকে নিজেদের দাবির সমর্থনে প্রচার মিছিলও চোখে পড়ল তিওর এলাকায়। এলাকাবাসীরা স্পষ্ট জানালেন, গ্রামে পাকা রাস্তা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে এক ইঞ্চি নড়বেন না। এতদিন আবেদন-নিবেদন জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে তিওর থেকে শুরু করে জঙ্গিপাড়া পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটিতে কখনওই পিচ পড়েনি। ফলে রাস্তাটির যে কী

স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ভোট এলেই রাস্তা পাকা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, প্রকল্পে এত এত টাকা মঞ্জুর হয়েছে— এ কথাও শোনান। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশা কোনওভাবেই ঠিক হয় না। এবার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ামাত্রই তাই গ্রামবাসীরা আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের দাবিকে যেমন পোস্টার, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরবেন, একইভাবে তাঁরা বুথে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকেও প্রকাশ্যে জানাবেন। ঘটেছেও তা-ই।

হাল গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় হয়ে থাকে তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। এতদিন গ্রামের মানুষ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলের দরজায় পৌঁছেছেন, দরখাস্তের পর দরখাস্ত জমা দিয়েছেন, নানাভাবে তাঁদের সমস্যার কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গ্রামবাসীদের কথায় কর্ণপাত করেনি প্রশাসন। প্রতিনিয়ত চলতে-ফিরতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে মানুষকে। স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ভোট এলেই রাস্তা পাকা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, প্রকল্পে এত এত টাকা মঞ্জুর হয়েছে— এ কথাও শোনান। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশা কোনওভাবেই ঠিক হয় না। এবার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ামাত্রই তাই গ্রামবাসীরা আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের দাবিকে যেমন পোস্টার, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরবেন, একইভাবে তাঁরা বুথে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকেও প্রকাশ্যে জানাবেন। ঘটেছেও তা-ই। তিওর থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে গ্রামবাসীদের রাস্তার দাবি নিয়ে পোস্টার যেমন নজরে পড়ল, একইভাবে তাঁদের কথাতেও স্পষ্ট করে ফুটে উঠল ভোট বয়কটের ডাক। তাঁরা যে এবার কোনও প্রতিশ্রুতিতেই ভুলবেন না, সে কথাও নির্দ্বিধায় জানালেন। রাস্তা না হওয়া পর্যন্ত মানিকচক বিধানসভার পাঁচটি বুথের কয়েক হাজার ভোটার ভোট উৎসবে তাই কোনওভাবে শামিল হচ্ছেন না। এই অনড় সিদ্ধান্ত কি প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক ধরনের হুঁশিয়ারি নয়? ভোট বয়কটের ডাক যেন মালদা জেলায় এবার সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মানিকচকসহ আরও বহু বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট বয়কটের ডাক যেন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। নিজেদের এলাকার উন্নয়নের দাবিকে সামনে এনে মানুষ এবার মিছিল-মিটিংও করছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে চাঁচল মহকুমা, রতুয়া বিধানসভা ক্ষেত্রে জয়ী প্রার্থী জনতাকে দিয়েছিলেন বহু প্রতিশ্রুতি। বলেছিলেন, এলাকার অধিকাংশ সমস্যা সমাধান করে এক সুন্দর নাগরিক পরিষেবা উপহার দেবেন তিনি। কিন্তু ভোট পেরোতেই তাঁকে আর এলাকার মানুষরা নাকি চোখের দেখাও দেখেননি। পথঘাটের বেহাল অবস্থা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবার নিদারুণ অবস্থাকে তাই এই কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকার মানুষ সামনে নিয়ে এসেছেন ভোট বয়কটের সমর্থনে। তাই এলাকার মধ্যে চলতে-ফিরতে অবিরতই চোখে পড়ে পোস্টার, ফেস্টুন-সহ আরও নানা ধরনের প্রচারসামগ্রী। দু'-একটি বিক্ষোভ মিছিলে জনস্রোত দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সত্যিই কি এত মানুষ ভোট বয়কটে শামিল হবেন? একটি কেন্দ্রে এত মানুষ যদি বুথ থেকে মুখ সরিয়ে নেন তাহলে নির্বাচনব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবস্থা যে খুব করুণ তা ভাবতে কষ্ট হলেও তা বাস্তব। এক তো সমগ্র মালদা জেলা সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সামাজিক সমস্যায় ক্ষতবিক্ষত। সমাজের ন্যায়নীতি, এমনকি রীতি-পদ্ধতিতেও যে সংক্রমণ ঘটেছে তা ভাবতে বাধ্য হতে হয়। তারপর যদি নাগরিক পরিষেবা দিতে প্রশাসন এতটাই উদাসীন হয়ে পড়ে তাহলে সমাজ-রাজনীতি সবই প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এরকম পরিস্থিতিতে একটি বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েক হাজার মানুষ যদি প্রকাশ্যে ভোট বয়কটের ডাক দেন, তাহলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে যে ভয়ংকর ক্ষতিকর তা বিস্তারিত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

বুথে যেতে চাইছেন না হাজার দশেক মানুষ

উত্তরবঙ্গ ভোট প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী যখন পাহাড় থেকে সমতলে মাইলের পর মাইল হাঁটছেন, তখন মালদা জেলার গাজল ও চাঁচলে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন কয়েক হাজার স্থানীয় মানুষ। দু'-একটি জায়গায় তাঁরা তাঁদের দাবিদাওয়াকে সামনে নিয়ে জাতীয় সড়কও অবরোধ করেন। রাস্তা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা না হলে ভোটকেন্দ্রেই যাব না, ভোটও দেব না— এমন দাবিকে প্রকাশ্যে আনেন স্থানীয় আদিবাসীরা। তাঁদের ভোট বয়কটের ডাক শুনে ছুটে আসেন গাজলের বিডিও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। আদিবাসী অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকার রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যার কথা শুনে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেসবই তো ভোট মিটে যাওয়ার পরে। স্থানীয় মানুষ এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গত দু'-তিনটি ভোটের আগে শুনেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভোট মিটে গেলে পরিস্থিতি যেমন, তেমনই পড়ে থাকে। তাই বিডিও-র কথায় তাঁরা কর্ণপাত করেন না। গাজলের আলাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাকাসুরা আদিবাসী পাড়ায় ভোটারসংখ্যা কয়েকশো। মানিক মুদি, সুশীল কুড়া, সুকুমার কুড়াদের কথা থেকে স্পষ্টতই তাঁদের সমস্যার কথা যেমন জানা গেল, এটাও বোঝা গেল যে, তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল। কাজ না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রতিশ্রুতিতেই তাঁদের মন ভুলবে না। কারণ, তাঁরা ভোট বয়কটের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্য দিকে, রাস্তা সংস্কার এবং পাকা সেতুর দাবিতে মালতীপুর বিধানসভার চাঁচল ব্লকের প্রায় ১০০০০ মানুষকে দেখা গেল ভোট বয়কটের কর্মসূচিতে শামিল হতে। নিজেদের দাবির সমর্থনে তাঁরা সে দিন যেমন মিছিল করেন, তেমনি দাবিপূরণ না হলে ভোটাররা বুথমুখী হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন। এলাকার প্রবীণ, নবীন এবং মহিলারাও সোচ্চারে জানান, চাঁচল ব্লকের শৌলমারি থেকে শুরু করে মাকাইয়া ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা বছর আষ্টেক আগে তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সে কাজ কয়েকদিন পরেই বন্ধ হয়ে গেল কেন? তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর চান না। চান চূড়ান্ত বেহাল রাস্তা দিয়ে চলতে-ফিরতে তাঁদের যেভাবে নাকাল হতে হচ্ছে তা বদলাতে হবে। তা না হলে গ্রামের কেউ বুথমুখী হবেন না। এ ছাড়া মালতীপুরে নদীর উপর একটি পাকা সেতুর দাবিও তাঁদের দীর্ঘ দিনের। সেটির কাজও এখনই শুরু না হলে ভোট বয়কট।

ডুয়ার্স থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় এবার ভোটের প্রাক-মুহূর্তে স্থানীয় দাবিদাওয়াকে সামনে এনে প্রত্যন্ত গ্রাম, আদিবাসী গ্রামসহ গ্রামাঞ্চলের মানুষ যেভাবে ভোট বয়কটের আওয়াজ তুলেছেন তা কীসের ইঙ্গিত? এই বিধানসভা ভোটের আগে এভাবে মানুষ কেন বুথ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন তা রাজনৈতিক দলগুলিকে যেমন চিন্তায় ফেলেছে, একইভাবে আগামী দিনে দুশ্চিন্তায় ফেলবে সমাজ-রাজনীতিবিদদেরও। কারণ বুথমুখী না হওয়া কিংবা ভোট বয়কটের ডাক প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক ধরনের জেহাদ ঘোষণা হলেও, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর পক্ষে তা মোটেও শুভ নয়। এর থেকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর যে মানুষ আস্থা হারাচ্ছেন— এমন ইঙ্গিত যেমন উঠে আসে, তেমনই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাতেও আঘাত লাগে জোর।

ডুয়ার্স ব্যুরো

দেওয়াল লিখিয়েদের মাথায় হাত

নির্বাচনবিধি আগেও ছিল, এবারও আছে। রাজনৈতিক দলেরও ভোটযুদ্ধে আছে কৌশল। তবে ভোটারদের সমর্থন আদায়ে প্রচারই শেষ কথা। জোরদার সোশাল মিডিয়ার যুগে ফেসবুক, টুইটার, হোয়াট্‌স্‌অ্যাপ-এর এখন বাড়বাড়ন্ত। তাহলেও দেওয়াল লিখনে এখনও ভোটারের চোখ আটকায়। এ কথা দলমত নির্বিশেষে সব প্রার্থী-কর্মী-সমর্থকই মানেন। দেওয়াল লিখনে ফুটে ওঠে ক্যালিগ্রাফি থেকে শুরু করে ছড়া-ছবি-কার্টুন। দল ও প্রার্থীর পক্ষে তা এক ধরনের শ্লাঘা। অন্য দিকে বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ। এমন অনেক দেওয়াল লিখন নজরে আসে, যার ক্যালিগ্রাফি, রং-রেখার মধ্যে যথেষ্ট নান্দনিক লক্ষণ ধরা পড়ে। ভোট এলেই দেওয়াল লেখার কাজে একদল যুবক ব্যস্ত হয়ে পড়ে বহুকাল যাবৎ। দিনরাত এক করে পাড়ায় পাড়ায় চলে তাদের রং-তুলির বহর। দলের বরাত অনুযায়ী কাজ করে এই সময়ে একটু হলেও উপার্জন বাড়ে। আর ভাল লিখিয়েদের কদর যে আলাদা তা বলার দরকার পড়ে না। তবে দেওয়াল-লেখার প্রচলিত ধারাটি এবার অনেকটাই গিয়েছে বদলে। সময় বদলেছে, পালটে গিয়েছে প্রচারের ধরন। দেওয়াল লিখনের জায়গা আজ দখল নিয়েছে ফ্লেক্স, কাটআউট, হোর্ডিং। রাজনৈতিক দলগুলি দেওয়াল লেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বেশি চাইছে ওইগুলি। কারণ তুলনায় প্রচারে সুবিধা বেশি অথচ খরচ কম। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রার্থীর ছবি ইচ্ছেমতো গ্রাফিক্স আর রঙের ব্যবহারে ফ্লেক্স-কাটআউট-হোর্ডিং-এ অনেক বেশি নজর কাড়ে। কিন্তু ফ্লেক্স যে প্লাস্টিকের মতো ক্ষতিকারক, তাই সেটা সরিয়ে রাখছেন প্রায় সবাই। আর এসব জেনে-বুঝে ফ্লেক্স প্রস্তুতকারকরা প্রতি বর্গফুটে দাম প্রায় ১ টাকা কমিয়ে বাজার ধরে ফেলেছেন। ফলে দেওয়াল লিখিয়েদের মাথায় হাত। রং-তুলির দাম আগের তুলনায় বেড়েছে প্রচুর। পারিশ্রমিক বাবদ মূল্য কমালে হাড়ভাঙা খাটুনির দাম কিছুই প্রায় হাতে থাকে না। ফলে ভরা ভোটবাজারে কপাল পুড়েছে দেওয়াল লিখিয়েদের।

নিশ্চিহ্ন গ্রামের ভোটার

সাধিপুর একটি গ্রামের নাম। জেলা প্রশাসনের খাতায়-কলমে তেমনটাই জানা যায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিন্দোল পঞ্চায়েতের অধীনে সেই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগে। না, কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানে বন্যা, খরা বা ভূকম্পনের মতো ঘটনাও ঘটেনি এখানে গত ৫০ বছরে। তবে সে গ্রামের অস্তিত্ব এখন আর নেই। গ্রাম জুড়ে পড়ে আছে খাঁ খাঁ প্রান্তর। গ্রীষ্মের অগ্নিবাণে মাঠ পুড়ে ছারখার হয়। বৃষ্টিতে জমা জলের আড়ালে চেয়ে থাকে ঘাস-লতাপাতা। এক সময় যে মাটির ঘরবাড়িগুলি ছিল, তার ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আর আছে পরিত্যক্ত একটি সমাধিস্থল। গত শতকের ছয়ের দশকের

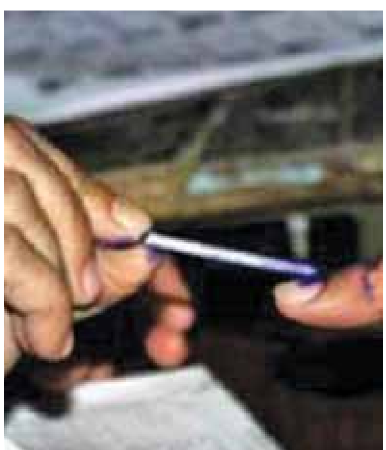

মাঝামাঝি সময়ে কলেরা, কালাজ্বর, মহামারির আকার ধারণ করে এই গ্রামে। এর পর খাদ্যের অভাবে নিদারুণ দরিদ্র মানুষ উজাড় হয়ে যায়। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে সাধিপুর গ্রামের নাম উত্তরবঙ্গের মানচিত্র থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সূর্য ডুবলেই প্রায় দেড়শো একর জুড়ে সাধিপুরের মাটিতে নেমে আসে কঠিন অন্ধকার। সূর্যালোক এখানে কোনও দিনের ঘোষণা করে না। কারণ, এখানে কী বা দিন, কী বা রাত। তবে এখানেও একদা মানুষের বসতি ছিল। এখানেও ছিল জনজীবনের স্পন্দন। এখন সব অতীত হলেও বিন্দোল পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সাধিপুরের অস্তিত্ব রয়েছে ভৌগোলিক মানচিত্রে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এমন একটি গ্রামে মিলেছে ভোটারের হদিশ। যদিও সংখ্যায় মাত্র ১ জন। ভোটারের নাম লালমোহন মার্ডি। বয়স ৭০। তিনিও গ্রাম ছেড়েছেন বহু বছর আগে। কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নামটি রয়ে গিয়েছে সাধিপুরের ঠিকানাতে। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে সাধিপুরের একমাত্র ভোটারের জন্য কোনও বুথ নিশ্চয়ই বসবে না। বর্তমান বাসস্থান বিশরাইল গ্রাম হলেও সেখানেও তিনি ভোটাধিকার পাবেন না। তাহলে কি তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত সাধিপুরের মতোই উবে গিয়েছে?

এবার ভোটদান আসল পরিচয়েই

আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ১১,০৮,৭৫৯। এঁদের মধ্যে কয়েকজন এমন ভোটদাতাও আছেন, যাঁরা এতদিন ভোট দিতেন নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রেখে। নিজেদের সত্তায় পুরুষ কিংবা নারী না হয়েও পরিচয় লুকিয়েই ভোটের লাইনে এসে দাঁড়াতেন। নির্বাচনবিধিতেও হয়ত সে বিষয়ে সেরকম কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল না। এলাকার মানুষ কিন্তু তাঁদের আসল পরিচয় জানতেন। হয়ত বুথের দায়িত্বে থাকা কর্মী-অধিকর্তারাও তাঁদের আচরণ থেকে পড়ে নিতেন আসল পরিচয়। ঘটনা যাই হোক, ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও সমস্যাই ছিল না এযাবৎ। তবে এটা ঠিক, সাধারণের চোখে তাঁরা একটু অন্য, তাই তাঁরা আলাদা। এমনকি পরিচয়পত্র থেকে ভোটার তালিকাতেও তাঁরা 'আদার' কিংবা 'ও' টিক মারা। তবে দেশের উচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায় পেয়েছেন তাঁরা। তাই এবার নিজেদের আসল পরিচয় নিয়েই লাইনে দাঁড়াবেন— এটা ধরে নেওয়াই

যায়। যদিও ‘ট্রান্সজেন্ডার’ হিসাবে লিপিবদ্ধ ভোটাধিকার ছিল ১৯৯৪ সাল থেকেই। এবার ‘আদার সেক্স’ বা ‘থার্ড জেন্ডার’ পুরভাষায় শিক্ষিত সমাজে হিজড়ে নামে পরিচিত এমন ১২ জন ভোটার থাকছেন আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে। অঙ্কের হিসেবে সংখ্যাটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। ওই তৃতীয় লিঙ্গের ভোটে জয়-পরাজয়েরও নিষ্পত্তি ঘটবে না, কিন্তু কেন্দ্রের সব গণতান্ত্রিক প্রার্থী তাঁদের কাছে ইতিমধ্যে ভোট প্রার্থনা করেছেন করজোড়ে। এতদিন লুকিয়ে মত প্রকাশ ছিল একটা সামাজিক প্রহসন। ২০১৪-র ১৫ এপ্রিল ‘রাইটস অব ট্রান্সজেন্ডার’ বিল কিছুটা হলেও বদলাতে পেরেছে তাঁদের অধিকারের সংকুচিত ক্ষেত্র। ২০১৬-র ২৬ ফেব্রুয়ারি লোকসভার নিম্নকক্ষের সিদ্ধান্তে আলাদা পরিচয়ে ভোটাধিকার দেওয়ায় ছবিটা কতটা বদলাল, সেটা তাঁরা দেখতে পাবেন ১৭ এপ্রিল ভোটের দিন।

ভোটরণে ছড়া-ছন্দ

চৈত্র মাসে রোদের পারদ চড়ছে। বাড়ছে ভোট প্রচারের মাত্রা সমান তালে। দেওয়াল লিখনে রঙ্গব্যঙ্গের ছন্দ-ছড়া এবার ডুয়ার্সে ভোট প্রচারে নজর কেড়েছে। ওইসব ছন্দ-ছড়া পাড়ার দেওয়াল থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ফেসবুক, টুইটার, হোয়াট্‌স্‌অ্যাপে। কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি বিধানসভা এলাকার বেশ কিছু দেওয়ালে চোখ আটকায় তৃণমূল সমর্থকদের লেখা ভোট-ছড়ায়। ‘ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল/ নাটাবাড়ি কেন্দ্র জিতবে তৃণমূল’। এমন ছড়ায় মাথায় মাখা ঠান্ডা তেলের বিজ্ঞাপনের ছায়া মেলে। কিন্তু ভোটাররা যে এ ধরনের ছড়া একবার দেখে মনে মনে তিনবার আওড়াবেন, সে কথা বলাই যায়। অন্য দিকে ওই ছড়ার পালটা জবাব দিতে পিছিয়ে থাকে না বিরোধীরা। তারা জবাব দেয়, ‘ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল/ ঘুষ নিয়েছে তৃণমূল’। জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কয়েকটি দেওয়ালে একই ছড়ার সামান্য অদলবদল ‘ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল/ এবারও ফুটবে ঘাসফুল’। এখানেও বিরোধীরা জবাব দিচ্ছে ওই একই ছড়াতে, ‘ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল/ ২০১৬ = নির্মূল’। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে শাসকদল ও বিরোধীরা তাদের ভোটপ্রার্থীদের সমর্থনে যেসব দেওয়াল লিখেছে, তাতেও ছন্দ বা ছড়ার আধিক্যই চোখে পড়ে। ‘কোদাল-বেলচা, হাত, কাস্তে-হাতুড়ি-তারা/ তৃণমূল হবে এবার বাংলা ছাড়া’। বোঝাই যায়, বিরোধী দলের প্রার্থীর সমর্থনেই এই ছড়া কাটা। পালটা জবাব দিতে ছাড়ে না শাসকদল, ‘চোখ খুললেই জোড়া ফুল/ সারা বাংলায় তৃণমূল’। এমন আরও বহু ছন্দ-ছড়া ছড়িয়ে আছে ডুয়ার্সের দেওয়াল জুড়ে। ‘জণগন দিচ্ছে ডাক/ তৃণমূল নিপাত যাক’— বিরোধীদের এই ছড়া-কাটা স্লোগানের জবাব দিচ্ছে শাসকদল, ‘হাতে হাতে ঘাসফুল/ ঘরে ঘরে তৃণমূল’ ইত্যাদি। কারা কাটছে এমন সব ছড়া? নজরকাড়া এ ধরনের প্রচারের পরিকল্পনাই বা কাদের? দলীয় সূত্রে যে খবর মিলছে, তাকে মোটেও সঠিক বলে মানা যায় না। এর পিছনে পেশাদার বিজ্ঞাপন সংস্থার মাথা যে কাজ করছে, তা মানতেই হবে। ছড়ার মাধ্যমে অনেক কথা সহজে তুলে ধরা যায়। আর তা শুধু নজর নয়, মনও কাড়ে। তবে ছন্দ-ছড়ার এই ফায়দা শেষ পর্যন্ত কারা ঘরে তুলবে তা জানা যাবে ১৯ মে।

ভোটাশার বালুচরে

ঘাসফুল চেল্লায়, ‘এ তো ভারি চাতুরি!
হতভাগা হাত কিনা পাকড়ালো হাতুড়ি!’
জোট বলে, ‘তৃণ সেরা দুর্নীতি কায়দায়
নারদায় ফাঁস হল কে কীভাবে খায়দায়!’
বিজেপির আশা ভারি তৃণ-কং-সিপিএম
সব কটা ঝাড় খাবে খোলা হলে ইভিএম!

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

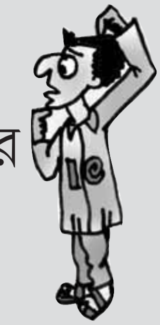

১

জলপাইগুড়িতে ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার ‘আড্ডাঘর’-এ সময় কাটানোর জন্য গিয়ে দেখি হেলিকপ্টার নামানোর জায়গা নেই। তাই পাশেই রবীন্দ্রভবনের মাঠে হেলিকপ্টার রেখে যেই বেরিয়েছি, দেখি ব্যাটা পটলরাম পর্যটক। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আড্ডাঘরে নাকি?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ।’ আমি বললাম, ‘কোত্থেকে?’ শুনে সে হেঁয়ালিমার্কা একটা পদ্য শোনাল। সেটা হল—

মাঝখানে কেটে দিলে বাঁশ হবে ভাই
তবে তাতে চন্দ্রের বিন্দুটা নাই।

পদ্যের অর্থটা বুঝলেন কিছু?

২

ডুয়ার্সের অর্থনীতি নিয়ে অক্সফোর্ড ফেরত সিমা রাহার লেখা ‘বোরলি থেকে বোরোলিন’ একদা যে আলোড়ন ফেলেছিল, আজ তা লোকে ভুলে গিয়েছে। নামের বানান ভুল মনে হলেও তিনি ‘সিমা রাহা’ই লিখতেন। তাঁর কথা লিখব বলে খোঁজ করছিলাম তিনি কোথায় থাকতেন। তখন কে জানি বললে, ‘গভীরে যাও! নামের গভীরে’!
গেলাম আর পেলাম। পেলেন?

৩

আচ্ছা, বলুন তো—
চিরকুমার মদনবাবুর ডুয়ার্সের কোথায় থাকা উচিত?

গতবারের উত্তর— ১) বারবিসা (বারোভিসা), ২) কাঠাম বাড়ি।

প্রথম সঠিক উত্তরদাতা—
রাজকুমার মিত্র, দেশবন্ধুপাড়া, জলপাইগুড়ি

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

নেতৃত্বের ব্যাটন তো অশোক ভট্টাচার্যর হাতে তুলে দেওয়া উচিত

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার আগেই কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের মধ্যে বাঘে ও গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার ঘটনার মতো নির্বাচনী মঞ্চ গড়ে উঠবে। ঘোষিত হয়েছে নির্বাচনের কর্মসূচি। প্রকাশিত হয়েছে নির্বাচনের প্রার্থীর নাম। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক নন্দলালদের দেশসেবার প্রতিযোগিতায় প্রার্থীতালিকায় নাম ওঠাবার তীব্র প্রতিযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় আছে ৫৪টি আসন। ডি এল রায় যুগদ্রষ্টা কবি। তাই জানিয়ে গিয়েছিলেন, দেশসেবার জন্য এ দেশে জন্ম নেবে হাজার হাজার নন্দলাল। তারা জানে, এখন আর ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। স্বাধীন দেশের রাজপ্রতিনিধি হতে প্রথমেই দেশের স্বার্থে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার উপকরণগুলি হস্তগত করে দেশসেবার জন্য সেই কঠোর দায়িত্বপালনে প্রার্থী হবার প্রতিযোগিতার দৌড়ে নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। একবার দেশসেবার ক্ষমতার মন্দির বিধানসভা বা লোকসভার সেই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে নিজেদের এই সযত্নে পালিত শরীরটাকে গদির চেয়ারে এলিয়ে দিতে পারলেই সারাজীবনের নামে জনসেবকের স্থায়ী টিকা পরিধানের নিশ্চয়তা।

আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচন গণতন্ত্রের মূল বুনিয়াদ। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সম্মানিত এবং আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেন আমাদের দেশের নীতি। তাঁদের উপর আমাদের আস্থা রাখতেই হবে। তাই প্রার্থীর পরিচয় এবং কোনও এলাকার ও সেই সঙ্গে সে রাজ্য বা দেশের নীতি নির্ধারণে কতখানি ভূমিকা নিতে পারে, সে নিয়ে নির্বাচকদের একটা তীব্র কৌতূহল থাকে। এতদিন মূলত উত্তরপ্রদেশের তথা উত্তর ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতেই দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের মুকুট উঠবে— এটাই যেন ছিল অঘোষিত নীতি। পি ভি নরসীমা রাও ও স্বল্পকালীন সময়ে দেবগৌড়ার হাতে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অর্পিত হওয়া ছিল যেন নিতান্তই একটা অঘটন। নরসীমা রাও অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষ হলেও দীর্ঘকাল ধরে কেন্দ্রের মন্ত্রী থাকায় বলতে গেলে দিল্লি তথা উত্তর ভারতের বাসিন্দা বলেই গণ্য হতেন। তা ছাড়া বহুভাষী

নরসীমা রাও অনেক হিন্দি ভাষীর থেকেও ভাল হিন্দি ভাষী ছিলেন। দেবেগৌড়ার বিরুদ্ধে সংসদেই হিন্দি ভাষীরা অভিযোগ তুলেছিলেন, যিনি হিন্দিতেই বলতে পারেন না, তিনি কেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন? অর্থাৎ উত্তর ভারতের সাংসদ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা না জানলেও ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী হলে কোনও আপত্তির কারণ না হলেও দক্ষিণ ভারত থেকে প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে আঞ্চলিকতার প্রশ্নটা বহুভাষী ও সম্পদ বণ্টনের অসাম্যের দেশ ভারতবর্ষে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে আঞ্চলিক ভাবনা। একটা বিশ্বাস ও প্রত্যাশা দানা বাঁধে, তাঁর এলাকার প্রতিনিধির যদি ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার সুযোগ থাকে, তবে তাঁর এলাকার উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর আসনটা তো অনেক দূরের কথা। কেন্দ্রের রেল মন্ত্রিত্বের দাবিদারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ললিতনারায়ণ মিশ্র ও নীতীশ কুমার রেল মন্ত্রী হয়েই বিহারের জন্য অনুমোদন করিয়েছিলেন নানা রেল প্রকল্প। মালদার গণিখান চৌধুরী রেল মন্ত্রী হয়ে মালদার চেহারাকেই রেলের নানা প্রকল্পে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেল মন্ত্রী ছিলেন, তখন সংসদে রেল বাজেট পেশ করার সময় বিরোধী দল থেকে তো বটেই, এমনকি তিনি যে জোট মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন, তারাও হইচই বাধিয়ে দাবি করত, এটি কেন্দ্রীয় রেল বাজেটের পরিবর্তে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রেল বাজেট। অস্বীকার করার উপায় নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেল বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হত সিংহভাগ। আবার এ রাজ্যে অভিযোগ উঠত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেল বাজেটে রাজ্যের জন্য যা বরাদ্দ হত, তার সিংহভাগই বরাদ্দ হত গঙ্গার ওপার তথা দক্ষিণবঙ্গের জন্য।

এখানে অবশ্যই থাকে ভোটের রাজনীতি। অমেথি থেকে নির্বাচিত হতেন ইন্দিরা গান্ধি। বেনারস থেকে এবার গুজরাতি হলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার নির্বাচকমণ্ডলীর মন জয় করতে নেওয়া হয়েছিল বা নেওয়া হবে নানা প্রকল্প। কারণ, পরের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীদের জবাব দেবার পালা, সেখানকার জন্য তিনি কী করেছেন? আবার প্রধানমন্ত্রী হবার প্রাথমিক শর্তই তো নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনে নির্বাচিত হয়ে আসা।

যেটি সারা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেটি তো কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সত্য। পশ্চিমবঙ্গ এর ব্যতিক্রম নয়।

সারা ভারতের রাজনীতিতে যেমন উত্তর ভারত, বিশেষ করে হিন্দি ভাষীরাই নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের মানসিকতাকে বজায় রাখে। পশ্চিমবঙ্গে কী রাজনৈতিক, কী অর্থনৈতিক, কী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা ও তার সংলগ্ন হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরই যেন সারা বাংলার অভিভাবকত্বের একচেটিয়া অধিকারের সোল এজেন্সি নিয়ে বসে আছে। এর বাইরে তারা কর্তৃত্বের লাগাম ছাড়তে রাজি নয়।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে তৃণমূলের অশ্বমেধ ঘোড়ার রথ সর্বত্র অপ্রতিহত গতিতে ছুটতে ছুটতে শিলিগুড়ির পুরসভার নির্বাচনে থমকে গেল। এখানে সে দিন সিপিএম-কংগ্রেস, এমনকি বিজেপি-র সঙ্গে এক অঘোষিত বোঝাপড়ায় তৃণমূলকে প্রতিহত করতে যে আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য মঞ্চ গড়ে উঠেছিল, তা ঘোষণা ছাড়াই তৃণমূল বিরোধী ভাবনার মননে সেই টেলিপ্যাথির স্পন্দনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন তো এই রাজ্যের বামপন্থী সিপিএম-এর নেতৃত্বের ভাবনাতে কংগ্রেসের সঙ্গে মঞ্চ গঠন তাদের কল্পনাতে এনে, বাম পোশাকে কোনও দাগ পড়ার কথা ভাবতেই পারেনি। আজীবন কংগ্রেস বিরোধিতার মঞ্চে পালিত হওয়া কংগ্রেস নেতৃত্বও কংগ্রেসের সঙ্গে সংগঠন— এই বিষয় নিয়ে আবার ভাঙনের কিনারায় এসে দাঁড়ায়।

এখানেই উপস্থিত বলা যেতে পারে আজকের অশোক মডেলের এই ভাবনা।

৩৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনক্ষমতা হারিয়ে এ রাজ্যের সিপিএম নেতারা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অসহায় দৃষ্টিতে রাজনৈতিক রণকৌশল নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রর 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারের মতো রাজনৈতিক বনভূমিতে পথ হারিয়ে পথ খুঁজে চলেছেন, তখন ব্রাত্য উত্তরবঙ্গের এক নেতা অশোক ভট্টাচার্য যেন সেই কপালকুণ্ডলার মতোই রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পথ দেখাতে তাঁর রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়ে উপস্থিত হলেন।

রণক্ষেত্রে আলেকজান্ডার জয়ী হয়েছিলেন বলেই তিনি 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট'। পরাজিত হলে তিনি অবশ্যই ধিকৃত হতেন 'পররাজ্য আক্রমণকারী দস্যু' বলে। সে দিন অশোক ভট্টাচার্য তাঁর দলের গৃহীত নীতির বাইরে এসে অঘোষিত এই রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে একের পর এক নির্বাচনে দলের দুর্গ প্রাচীরের পতনের মধ্যে শিলিগুড়ির পুরসভায় তাঁর হারানো দুর্গকে ফিরিয়ে আনতে বিজয়ী হয়েছিলেন বলেই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মতো তাঁর রণনীতি আজ 'অশোক মডেল'-এ শুধু উচ্চারিত হচ্ছে তা নয়, তাঁর দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটিও তাদের পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বাইরে এসে একে তাঁদের রাজনৈতিক রণকৌশল বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কোনও রণক্ষেত্রে তিনিই হন সেনাপতি, যাঁর রণনীতি যুদ্ধ জয়ের জন্য গৃহীত হয় এবং সেই রণনীতি প্রয়োগের ফলে যুদ্ধে জয় হয়। রাজনীতিই তো সেই যুদ্ধক্ষেত্র। এখানেও প্রয়োজন উপযুক্ত সময়ে এমন রণনীতি নির্মাণ, যা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে পারে। আর যে নেতা সময়ের দাবিকে সঠিক মূল্যায়ন করে প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারেন, তিনিই হবেন দলনেতা।

তৃণমূল দলটিকে তার বিরোধীরা এক নেত্রী-শাসিত দল বলে সমালোচনা করেন। তাঁরা কিন্তু ভাবতে চান না, তৃণমূলের এই অসংখ্য সদস্য ও সমর্থক কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাদের নেত্রী বলে এমন মান্য করে। এর আগে তো এ রাজ্যে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একমাত্র অজয় মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ পালটা দল করে সফল হননি। অজয় মুখোপাধ্যায়ের বদলা কংগ্রেসের সাফল্যও ছিল সাময়িক, তাও আবার তৎকালীন সিপিএম নেতৃত্বের বাম-মোর্চার উপর নির্ভরশীল। এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা রাজ্যের মানুষের মনের ভাষা পড়ে তাকে রণনীতিতে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই রাজ্য কংগ্রেসে তাবড় তাবড় প্রবীণ নেতা থাকলেও তাঁরা যে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রণক্ষেত্রে পরাভূত হয়ে চলেছেন সেই দেয়াললিখনটা পড়তে পেরে। মমতা এ রাজ্যে সিপিএম বিরোধী জনতাকে রণক্ষেত্রে শামিল করতে দলের বাইরে এসে ঠিক করেছিলেন তাঁদের রণনীতিকে। সেই রণকৌশল তাঁকে যুদ্ধে বিজয়ী করেছিল বলেই তিনি হতে

পারলেন জননেত্রী। হয়ে উঠলেন রাজ্যের সিপিএম বিরোধী মানসিকতার মঞ্চ।

৩৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনক্ষমতা হারিয়ে এ রাজ্যের সিপিএম নেতারা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অসহায় দৃষ্টিতে রাজনৈতিক রণকৌশল নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রর 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারের মতো রাজনৈতিক বনভূমিতে পথ হারিয়ে পথ খুঁজে চলেছেন, তখন ব্রাত্য উত্তরবঙ্গের এক নেতা অশোক ভট্টাচার্য যেন সেই কপালকুণ্ডলার মতোই রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পথ দেখাতে তাঁর রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়ে উপস্থিত হলেন। লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের পর এই রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূলের হাতে পরাজিত হতে হতে তাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তখন শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনে অশোক ভট্টাচার্যর রণনীতির সাফল্য সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বকে যেন ভেন্টিলেশনের মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বার করে নিয়ে এসে বসার শক্তি জোগাল। একই নীতি প্রয়োগে যখন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদেও সাফল্য এনে দিল, তখন অশোকবাবুর এই রণনীতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো 'অশোক মডেল' বলে দলীয় নীতি হিসেবে গৃহীত হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকল না।

প্রশ্নটা অন্যখানে। যাঁর রণনীতি যুদ্ধের রণকৌশল বলে গৃহীত হয়, তাঁরই তো সেনাপতি হওয়ার কথা। তৃণমূলের সেনাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক রণকৌশল তাঁকে একের পর এক সাফল্য এনে দিচ্ছে। তাঁর রণনীতি তাঁকে বিজয়ী রথের সারথির আসনে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-বিমান বসুদের রণকৌশল যতদিন রণক্ষেত্রে জয় এনে দিয়েছে, ততক্ষণ তাঁদের নেতৃত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। আজ কিন্তু সিপিএম-এর নেতৃত্বে এসেছে শূন্যতা। কারণ কালের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিপক্ষের শক্তি পরিমাপ করে তারা বিজয়ের রণনীতি ঠিক করতে পারেনি। এখানেই অশোক ভট্টাচার্য সফল সমর নায়ক। তাই প্রশ্ন ওঠে, আগামীতে রাজ্য রাজনীতিতে বামফ্রন্ট যদি আবার এই রণনীতি প্রয়োগ করে বিজয়ী হতে পারে, তবে অশোক ভট্টাচার্যর হাতে কেন রাজ্যের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া যাবে না? কেন সূর্যকান্ত মিশ্র হবেন সেই বিকল্প নেতা? অথবা ক্ষমতায় না এলেও 'অশোক মডেল'-এ রণনীতির প্রয়োগে যদি সিপিএম উল্লেখযোগ্য ফল দেখাতে পারে, তবে রাজ্য নেতৃত্বের ব্যাটন কেন তাঁর হাতে তুলে দেওয়া যাবে না? বিমান বসুদের হাতেই কেন তা কুক্ষিগত হয়ে থাকবে?

অশোক ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের মানুষ। দক্ষিণবঙ্গ বাংলার উত্তর ভাগের মানুষের হাতে শুধু ক্ষমতার ব্যাটনের ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নেতৃত্বকে তুলে দিতে চায় না। এই কর্তৃত্ববাদী ভাবনার পরিবর্তনের সময় এসেছে। একই ভাষায় কথা বলেও তেলেঙ্গানার তেলুগু ভাষীরা উপকূলীয় তেলুগু ভাষীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সৃষ্টি করেছে তেলেঙ্গানা রাজ্য। উত্তরবঙ্গ কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গেই থাকতে চায়, তবে সমমর্যাদার দাবি নিয়ে। এই কথাটি শুধু সিপিএম-এর জন্যই নয়, রাজ্যের সব দলেরই ভাবার সময় এসেছে।

সৌমেন নাগ

তরাই-ডুয়ার্স কি পেতে চলেছে নতুন নেতৃত্ব ?

প্রত্যাশা নিয়েই শিবির বদলেছিলেন। তারপর সময়টা যে খুব ভাল কেটেছে, তাও নয়। তবু দিদির কাছাকাছি আসতে খুব দেরি হয়নি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাঁধে দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যভার, পাশাপাশি সমবায় ব্যাঙ্ক এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দায়িত্বভার। ডুয়ার্সের চা-বাগানের সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে সমবায়ের কথা বলে দলে সমালোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁকেই টিকিট দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর নিজের কথায় এই শহরকে চেনেন তিনি হাতের তালুর মতো। এখানেই তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি, ছাত্র-যুব আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন, এমনকী পৃথক জেলার স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর অবদান অস্বীকার করতে পারবে না আলিপুরদুয়ারবাসী। ভোটযুদ্ধে এই কেন্দ্রে অঙ্কের হিসেব যেমনটাই হোক না কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বিরোধী দলের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে। তাই জেতার ব্যাপারে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ফেলবেন— এমনটাই ‘এখন ডুয়ার্স’কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানাতে কুণ্ঠা করলেন না আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌরভ চক্রবর্তী।

‘রেকর্ড ভোটে জিতব, তারপরই বদলে দেব জেলার হাল’

প্রশ্ন: গত ৫ বছরে বহু বাম নেতা-কর্মী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সাদরে বড় বড় পদে বসিয়েছে। তাঁদের দাপটে বহু আদি তৃণমূলি নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন, তেমনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বাম-দলে থেকে যাওয়া নেতা-কর্মীরা। আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন, সীমান্তরক্ষার ব্যাপারটা তৃণমূলে নেই বলেই বেনো জলের সংক্রমণ ঘটেছে?

সৌরভ: শুধু বাম নেতা-কর্মীরাই নন, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল থেকেও বহু নেতা-কর্মী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন, আগামী দিনেও দেবেন। এই দলত্যাগ কিংবা শিবির ছেড়ে চলে আসা বিষয়টিকে আমি শাসকদলে নাম লেখানো বলে মনে করি না। এমনটাও নয় যে, তাঁরা শুধু শাসকদলে থাকার সুযোগ-সুবিধার জন্যই এসেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক লক্ষণ আছে, যাকে আমি গুরুত্ব দিই। এতে বাম কিংবা অ-বাম শিবির কিছুটা হলেও ধাক্কা খায়, সংগঠন দুর্বল হয়। অন্য দিকে তৃণমূল দল সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়। এতে দলের ভাল হয়েছে, ভোটের পক্ষে, এমনকি দলের পক্ষেও। তাই তৃণমূল তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে। আর সবাই যে খুব বড় পদ পেয়ে গিয়েছেন এমনটা ঘটেনি। একটি দলে যত নেতা-কর্মী যোগ দিয়েছেন, তত পদ তো থাকতে পারে না।

অন্য দলের নেতা-কর্মীরা বিরাট সংখ্যায় দলে যোগ দিলে তার মধ্যে কিছু সুযোগসন্ধানী থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক ন্যায়নীতি এবং আদর্শে খাপ খাওয়াতে না পারলে সে বা তারা আপনা-আপনিই দলে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে তৃণমূল দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলায় তারা কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। আর অন্য দলের নেতা-কর্মীরা দলে ঢুকে পদ পেয়েছেন যেমন

ঠিক, তেমনই দলের পুরনো নেতা-কর্মীদের সরানো হয়েছে এমনটা আপনি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার কোনও একটি ব্লকেও দেখাতে পারবেন না।

প্রশ্ন: যে যখন খুশি যে কোনও দলে সসম্মানে যোগ দিতে পারে, একে কি রাজনীতির আধুনিকতা বলবেন? যেখানে ন্যায়নীতির চাইতেও বড় করে দেখা হয় কে কতটা কাজের লোক বা সম্পন্ন মানুষ!

সৌরভ: দলত্যাগ কিংবা এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে যাওয়াকে আমি রাজনীতির আধুনিকতা বলব না। কারণ, তা দলের ন্যায়নীতি কিংবা আদর্শের চেয়ে বড় নয়। আমাদের দলে সবসময়ই কাজের মানুষ, রাজনীতি বোধসম্পন্ন মানুষই গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। তা ছাড়া বামেরা যদি আজ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে, সেখানে জাতীয় স্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ অনুসরণ করা ছাড়া আজ রাজনীতিতে আগ্রহী কোনও মানুষের পক্ষে কি অন্য দল করা সম্ভব?

প্রশ্ন: রাজনীতিতে ন্যায়নীতি শব্দটি সত্যিই কি অবলুপ্তির পথে? আপনার ধারণা কী? (যদি উত্তর হয় 'না') তাহলে এবারের কং-বাম জোট বা গতবারের কং-তৃণমূল জোটকে কী বলবেন? কী অজুহাত দেবেন, ন্যায়নীতি নয়, যুগের প্রয়োজনটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

সৌরভ: সব দলেরই ন্যায়নীতি এবং আদর্শ আছে, ভাল মানুষও আছে। কিন্তু অধিকাংশ দলেই আজ তা রয়েছে যথেষ্ট কম পরিমাণে। আমাদের নেত্রী যেভাবে দল পরিচালনা করেন, সেখানে ন্যায়নীতি বা আদর্শ নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। যখন তৃণমূল-কংগ্রেস জোট হয়েছিল, তখন একটা সুদূরপ্রসারী করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্তিশালী করতে হবে।

প্রশ্ন: আপনারা বলছেন কং-বাম জোট আদৌ টিকবে না। গতবারও কং-তৃণমূল জোট শেষমেশ টেকেনি। এখানে তো যুগের প্রয়োজনও দেখল না কোনও পক্ষই? তাহলে আসল উদ্দেশ্য কি যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখল? এটাই কি আজকের রাজনীতির মূল পাঠ?

সৌরভ: আসলে জোট হয় দু'টি বা তিনটি রাজনৈতিকভাবে কাছাকাছি দলের মধ্যে। আর জোটের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় মানুষের মধ্য থেকে। ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন তখনই আসে, যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের ও পথের দলগুলি জোট করে। যেমন ২০১১ সালে জোটের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আর আজ জোট হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করতে। সেই জোট কিন্তু কেরালা কিংবা ত্রিপুরায় থাকবে না। বিশদে বলার কি দরকার আছে, সেই জোটের মূল উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্ন: দুর্নীতির প্রশ্নে আপনি নিশ্চয়ই মানবেন না যে, তৃণমূলের উঁচুনিচু সব মহলেই কমবেশি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তবু জানতে চাইব, গত ৫ বছরের শাসনে কোনও খারাপ দিকই কি আপনার চোখে পড়ে না? নাকি দু'-একটা বলা যায়?

সৌরভ: রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ছিল এবং আছে। জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধি, এমনকি আজ এই মুহূর্তে নারদ চ্যানেলের স্টিং অপারেশন নিয়ে তোলপাড় সারা রাজ্য। দেখতে হবে, দুর্নীতি কি শুধুই অভিযোগ স্তরেই থেকে গেল, নাকি তা প্রমাণ করা গেল? তৃণমূল দল বা সরকারের বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির কোনও অভিযোগই কিন্তু আজ পর্যন্ত সিবিআই-ও প্রমাণ করতে পারেনি। তাহলে বুঝতে হবে, সেগুলো আসলে প্রোপাগান্ডা বা মিডিয়ার প্রচার।

প্রশ্ন: ডুয়ার্সে চা-বাগান একটি বড় ইস্যু। আপনার মনে হয় না, দীর্ঘ বঞ্চনা ও শোষণের বিষয়টি রাজনৈতিক নেতারা সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য কখনওই সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করেননি?

সৌরভ: ডুয়ার্সের চা-বাগানের সমস্যা সাম্প্রতিককালের নয়, দীর্ঘ কয়েক দশকের। ব্রিটিশ আমল থেকেই সমস্যা ছিল, যদিও তখনকার সমস্যা সেই সময়কালের, আর আজকের সমস্যা তৈরি হয়েছে সাড়ে তিন দশক ধরে। ঠিকই বলেছেন আপনি। এই দীর্ঘ ইস্যু ছিল। সেই ইস্যু উঠে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দাবি অনুসারে। আমরা তো জোট ভাঙিনি, আমরা কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলাম। আজ যে জোটের চেষ্টা হচ্ছে তা কি আদৌ জোট? সেখানে উদ্দেশ্য একটাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা, রাজ্যের উন্নয়ন, প্রগতি ইত্যাদি রুখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ন্যায়নীতি, আদর্শ জলাঞ্জলি দেওয়া বাম-কংগ্রেস ইত্যাদি দলগুলি। তাই অজুহাতের কোনও প্রশ্ন নেই। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নকে

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ছিল এবং আছে। জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধি, এমনকি আজ এই মুহূর্তে নারদ চ্যানেলের স্টিং অপারেশন নিয়ে তোলপাড় সারা রাজ্য। দেখতে হবে, দুর্নীতি কি শুধুই অভিযোগ স্তরেই থেকে গেল, নাকি তা প্রমাণ করা গেল?

ছবি: অনিমেষ চন্দ

‘আসলে জোট হয় দু’টি বা তিনটি রাজনৈতিকভাবে কাছাকাছি দলের মধ্যে। আর জোটের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় মানুষের মধ্য থেকে। ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন তখনই আসে, যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের ও পথের দলগুলি জোট করে। যেমন ২০১১ সালে জোটের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আর আজ জোট হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করতে। সেই জোট কিন্তু কেরালা কিংবা ত্রিপুরায় থাকবে না।’

সময় ধরে বাম-সরকার এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে শোষণ এবং বঞ্চনার রাজত্ব চালিয়েছে। তখনও বহু সমস্যা ছিল, সেগুলি তারা সমাধান করার কোনও চেষ্টাই করেনি। মালিকপক্ষের হাত শক্ত করতে এবং নিজেদের আখের গোছাতে এতটাই ব্যস্ত ছিল তারা, যে মূল সমস্যাগুলি ক্রমে এত বড় আকার ধারণ করেছে, যা আজ সহজে মেটানো সম্ভব নয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এবং রাজনৈতিকভাবে বাজিমাতের চেষ্টা তো রয়েইছে।

প্রশ্ন: আপনার কি মনে হয় না, দানখয়রাতি বহু গুণে বাড়িয়েও ডুয়ার্সের চা-বাগানের মূল সমস্যা সমাধান করা যাবে না? (যদি উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়) তবে তো বলব, আপনারাও মূলে না ঢুকে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সামলে আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন?

সৌরভ: চা-বাগান চালু রাখাই হল চা-বাগানের সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ। আর সেই সমস্যা মেটানোর অন্যতম অন্তরায় হল চা আইন, যেটি সংশোধন না করলে চা-বাগান সমস্যার সমাধান করা খুব কঠিন। তবে চা-বাগানের শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে যখন দিনের পর দিন খেতে পায় না, তখন তো মানবিকতার খাতিরে খাদ্যের বন্দোবস্ত করতেই হয়। আর ঠিক সময়ই সেই কাজটি করেছে রাজ্য সরকার। শুধু রেশন কিংবা খাদ্য-বস্ত্র-স্বাস্থ্যের দিকে নজরদারিই তো নয়, কেন্দ্রকে বারবার আইন সংশোধনের জন্য চাপ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় আইন সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকার চা-বাগান অচল করে রাখা মালিকদের জমির লিজ বাতিল করা ছাড়া আর কোনও ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারে না। রাজ্য সরকার তা করেছে। পাশাপাশি সমস্ত চা-বাগানের মানুষরা যাতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

প্রশ্ন: আপনি চা-বাগান সমস্যা সমাধানে চা শ্রমিকদের সমবায়ের কথা বলেছিলেন, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ মিলবে— এ কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না?

সৌরভ: আমার প্রস্তাব শুনে তো আমার দলের অনেকেই ভয়ংকর চটে গেল। শুধু তা-ই নয়, তারা আমার তীব্র সমালোচনাও করল। কিন্তু দলনেত্রী সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। এমনকি তিনি এ ব্যাপারে খুব উৎসাহও দেখিয়েছিলেন। এর পর আমি বহু বটলিফ চা-বাগান মালিকের নাম নথিভুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করি। তাদের সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে একটি করে কার্ডও দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে ওইসব চা-বাগান এবং তার মালিকদের সহায়তা করার প্রকল্প চালু হবে।

প্রশ্ন: ডুয়ার্সের আরেকটি কঠিন সমস্যা নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের জন্য প্রবল জনস্ফীতি। আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না যে, এর ফলে ডুয়ার্সের আদি বাসিন্দারা বহু ক্ষেত্রে নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন? এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম সুখকর হবে না মোটেই।

সৌরভ: এই বিষয়টি সম্পূর্ণতই সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এ বিষয়ে আমার মতামত দেওয়াটা আমি ঠিক নয় বলেই মনে করি। তাই এই বিষয়ে বিশদে না গিয়ে শুধু বলব যে, ডুয়ার্সের বহু এলাকার জমি খুব উর্বর। সেখানে কৃষির ফলনও হয় খুব ভাল। এখানকার কৃষকরা অধিকাংশই এক সময় পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন। যদিও তাঁদের অনেকেই আজ নানা কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। আর নেপালিরা কাজের খোঁজে পাহাড় থেকে নেমে এসে ডুয়ার্সের চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়েছেন। এর বেশি আমি বলতে চাই না।

প্রশ্ন: আলিপুরদুয়ারের মানুষ আপনাকে ভোট দিয়ে জেতাবে কেন? কেবল কি মমতা-সরকারের সাফল্যের খতিয়ান দেখেই? আপনার নিজস্ব কোনও ক্যারিসমা বা জনপ্রিয়তা রয়েছে বলে মনে হয়?

সৌরভ: আমি শুধু আলিপুরদুয়ারবাসীই নই, আলিপুরদুয়ারে গত ২৬ বছর যাবৎ আমি ছাত্র-যুব রাজনীতি করেছি। আমি অন্য কোনও পেশায় বা ব্যবসায় যুক্ত নই। আমি যে শুধু রাজনীতিই করি— এ কথা আলিপুরদুয়ারবাসী ভালই জানেন। বাম-বিরোধী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি যেমন এখানে রাজনৈতিক আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলাম, তেমনই মানুষের সবরকম সমস্যার পাশেই থাকার চেষ্টা করেছি। আলিপুরদুয়ারকে জেলার স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে লড়াই, সেখানে আমার কী ভূমিকা ছিল, তাও জেলাবাসী জানেন। আলিপুরদুয়ার শহরে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার আন্দোলনে আমার ভূমিকা জেলাবাসী অস্বীকার করতে পারবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত সাফল্যের পাশাপাশি আমার জনপ্রিয়তা খুব একটা কম নয়। সেটা আগামী নির্বাচনের ফলাফলেই প্রমাণিত হবে।

প্রশ্ন: ভোটে এবার আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল ভাবছেন কতটা?

সৌরভ: লড়াইয়ের ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখনওই দুর্বল ভাবা ঠিক নয়। তবে ভোটের ময়দানে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী অনৈতিক আঁতাঁত গড়ে ফেলেন, তবে তো তিনি মানুষের চোখে নিজেকে দুর্বলই করে ফেলেন। এখানে আমার লড়াইটা তাই একটু সহজই হয়ে যায়।

প্রশ্ন: নিজের দুর্বলতা কিছু কি খুঁজে পেলেন?

সৌরভ: শারীরিকভাবে তো পাইনি। আর রাজনীতি, সে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর দল যে দৃষ্টান্ত এ রাজ্যে স্থাপন করেছে, তাতে সক্ষমতা এবং দৃঢ়তা প্রতি মুহূর্তেই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন: জিতলে আলিপুরদুয়ারের জন্য প্রথম পাঁচটি কাজ কী করবেন?

সৌরভ: প্রথম এবং সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে এই জেলার যুবসমাজের কর্মসংস্থান। তারপর জেলাটিকে গড়ে তুলতে হবে সর্বাধুনিক জেলা হিসেবে, যেখানে সবকিছু সুযোগ-সুবিধার এক মেলবন্ধন থাকবে। এ জেলার ছাত্রছাত্রীদের দাবিমতো এখানে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করাটা খুব জরুরি। আলিপুরদুয়ারে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পর্যটনকেন্দ্র। সেগুলিকে ঘিরে আলিপুরদুয়ারকে একটি অন্যতম পর্যটন জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সব শেষে নজরে থাকবে গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য। সব মিলিয়ে শহরটিকে ‘এ’ ক্যাটেগরির শহরে রূপ দিতে হবে।

প্রশ্ন: জিতবেন তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কত ভোটে জিতবেন বলে আপনার অনুমান?

সৌরভ: যদি সমস্ত পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে, তাহলে মানুষ ভোট আমাকেই দেবেন। সে অবস্থায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি, আমি জিতব রেকর্ড সংখ্যক ভোটে।

সাক্ষাৎকার: **তপন মল্লিক চৌধুরী**

সুন্দরী প্যারেন

অবসর জীবনের একঘেয়েমিতে একদম হাঁপিয়ে উঠছিলাম। ঠিক করলাম কোথাও গিয়ে নিরিবিলিতে দু'-তিনটে দিন কাটিয়ে আসব। কিন্তু কোথায় যাব? বয়সের কারণে বেশি দূর যাওয়ার প্ল্যান আজকাল আর করতে পারি না। পর্যটনপ্রেমী বাল্যবন্ধু বাবু অনন্ত চৌধুরীর পরামর্শে অবশেষে মনস্থির করলাম কোলাহলবিমুখ দার্জিলিং জেলায় ভুটান সীমান্ত লাগোয়া পাহাড়-ঘেরা প্যারেনে যাওয়া।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চার বন্ধু মিলে দার্জিলিং মেলে রওনা দিলাম। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে টিকিট পেলাম না। ফলে ডুয়ার্সে ট্রেন যাত্রার আনন্দ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হলাম।

ইন্টারনেটের দৌলতে থাকার জায়গাও পেয়ে গেলাম পশ্চিমবঙ্গ ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অতিথিশালায়। প্যারেনে আর কোনও থাকার জায়গা নেই। থাকা যেতে পারে ১০ কিলোমিটার দূরে ঝালঙে। ওখানে ফরেস্ট বাংলো ছাড়া কিছু হোমস্টেও পাওয়া যায়।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে সকাল ন'টায় নিউ জলপাইগুড়ি। দীপক কুজুর যথারীতি গাড়ি পার্কিং-এ রেখে আমাদের অপেক্ষায় স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে। হাসিমারার ছেলে। ও-ই সবসময় আমাদের উত্তরবঙ্গ সফরের ড্রাইভার কাম গাইড। নিজের গাড়ি। গত বছর জলদাপাড়া, জয়ন্তি, বক্সা ওর সঙ্গেই ঘুরেছি। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বেড়ানোর জায়গা ওর নখদর্পণে।

পরিষ্কার ঝকঝকে দিন। লটবহর ডিকিতে উঠিয়ে গাড়ি ছুটল প্যারেনের উদ্দেশে। ঘণ্টা চারেকের যাত্রা। জলপাই মোড় হয়ে শিলিগুড়ি শহরে ঢুকে সেবক রোড ধরে চললাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। সেবক ব্রিজের কাছে এসে গাড়ি থামল। এখানেই প্রাতরাশের বিরতি। চা-টোস্ট দিয়ে হালকা ব্রেকফাস্ট সারলাম। আবার যাত্রা শুরু। তিস্তা নদীর সেবক ব্রিজ পেরিয়ে আমরা চলেছি। প্যারেনের লোকেশনটা ঠিক কোথায় জানতে চাওয়াতে দীপক বলল, চালসা পেরিয়ে খুনিয়া মোড়। ডান দিকে খুনিয়ার জঙ্গল, বাঁ দিকে চাপড়ামারি। খুনিয়া মোড় থেকে বাঁ দিকের রাস্তা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে। ওই রাস্তায় ঝালং পেরিয়ে যেতে হবে প্যারেন। খুনিয়া মোড় থেকে মোটামুটি ৪০ কিলোমিটার।

চাপড়ামারি জঙ্গলের নাম শুনে মনটা কেমন নেচে উঠল। সম্ভব কি যাওয়ার পথে একবার ঢুঁ মারা? পরিকল্পনা জানাতেই অন্য বন্ধুরা এক কথাতেই রাজি। দীপক বলল, বিকেল তিনটেয় জঙ্গল সাফারির ট্রিপ করা যেতে পারে। আর তার জন্য চালসায় ফরেস্ট অফিস থেকে বুক করতে হবে। দেড় ঘণ্টার ট্রিপ। কিন্তু প্যারেন পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে যাবে। অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার ওর পরিচিত। টেলিফোনে ডিনারের অর্ডার দিয়ে দেওয়া যাবে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছালাম ফরেস্ট অফিসে। একটায় অফিস খুলবে সাফারির টিকিট বিক্রির জন্য। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে তিনটের জঙ্গল সাফারির ট্রিপ বুক করে গেলাম দুপুরের খাবার খেতে। চালসা বাজারে রাস্তার ধারে একটা হোটেলে লাঞ্চ সেরে দেখলাম, এখনও হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে জঙ্গল সাফারি শুরু হতে। দীপক বলল, চলুন, মূর্তি নদী দেখে আসি। সেইমতো মূর্তি নদীর পাড়ে পৌঁছালাম। আগেও এসেছি এখানে। কিন্তু এবার পরিবর্তন লক্ষ করলাম যে, আগের দেখা সেই নির্জনতা হারিয়ে গিয়েছে। নদীর ধারে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল আর গেস্ট হাউস। তার উপর এখন প্রচুর ভিড় পিকনিক পার্টির। কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে মূর্তি নদীর ব্রিজ পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে এলাম জঙ্গল ট্রিপ করতে।

বিকেল ঠিক তিনটেয় গেট খুলতেই আমাদের জিপসি প্রবেশ করল চাপড়ামারি জঙ্গলে। জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে এগচ্ছি। দেখলাম, দুটো ময়ূর রাস্তা পেরিয়ে গেল। আরও এগিয়ে আমাদের গাড়ি ওয়াচটাওয়ারের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মতো আরও প্রায় ১৫-২০টি জিপসি টুরিস্ট নিয়ে এসেছে। চাপড়ামারি ফরেস্টের ওয়াচটাওয়ারের পাশেই রয়েছে বনবাংলো। পুরনো কাঠের তৈরি দোতলা বাংলো। প্রশস্ত ঘর আর তারপর চওড়া বারান্দা।

প্যারেন গেস্ট হাউস

ওয়াচটাওয়ারের সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আছে লবণকুয়ো। বন্য জন্তুরা ওখানে আসে লবণ চাটতে। ওয়াচটাওয়ারের সামনে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল প্রান্তরে একদল গাউর চরে বেড়াচ্ছে। পিঠে, মাথায় বকেদের ওড়াউড়ি। ওপাশে খানিকটা দূরে কয়েকটা বুনো শুয়োর। হঠাৎ নজরে পড়ল বাঁ দিকের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল তিনটে বার্কিং ডিয়ার। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের এক ঝলক দেখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনের জঙ্গলে। দাঁড়িয়ে আছি ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে। ওয়াচটাওয়ারে এখন রীতিমতো ভিড়। দূরে জঙ্গলের মধ্যে দেখা দিল একটা হাতির দল। তিনটে বড় হাতি আর দুটো ছোট হাতি, খুবই অস্পষ্ট। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। চারটে বাজতেই জিপসি ড্রাইভার তাড়া দিতে লাগল। এবার যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যেই আরও খানিকটা পশ্চিমে এক জায়গায় আদিবাসী নৃত্য দেখতে। বন বিভাগের উদ্যোগেই এই ব্যবস্থা। কোনও আলাদা দর্শনী লাগে না। আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখে ফেরত এলাম জঙ্গল গেটে। গেটের বাইরে দীপক অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। জিপসি ছেড়ে উঠে পড়লাম দীপকের গাড়িতে, গন্তব্য প্যারেন।

কোলাহল ও জনবহুল রাস্তাঘাট প্রকৃত অর্থেই ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল খুনিয়া মোড় থেকে বাঁ দিকে রাস্তায় ঢোকার পর। দু'পাশে জঙ্গল। মধ্যিখানে রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা। দিন ঢলছে সন্ধ্যার কোলে। বনানীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এক গা-ছমছমে রোমাঞ্চকর অনুভূতি। ঘণ্টাখানেক পর চলে এলাম ঝালং। এ অঞ্চলে মোটামুটি বড় জায়গা। বাজারের কাছেই একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর বেশ ক্লান্তি এসে গিয়েছে। কাপে কাপে পরিবেশিত হল চা আর আলু চিপ্‌স। ধোঁয়া-ওঠা চায়ে প্রত্যেকেই গলা ভিজিয়ে চাঙ্গা হলাম। এখানে বসে একটু সময় কাটিয়ে আবার চলা শুরু। আরও প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হবে প্যারেন।

১০ কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তা দু'ভাগ হয়েছে। বাঁ দিকে উঠে গিয়েছে প্যারেনে আর সোজা পথটি চলে গিয়েছে ভুটান সীমান্তবিন্দুতে। আমাদের গাড়ি বাঁ দিকের রাস্তা ধরল। এই রাস্তা ভাল নয়, ভাঙাচোরা। ছোট ছোট বোল্ডারের উপর দিয়ে গাড়ি প্রায় লাফাতে লাফাতে চলেছে। সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা পেরতে প্রায় ৪০ মিনিট লেগে গেল। সাড়ে সাতটায় আমরা পৌঁছালাম ২৬০০ ফুট উচ্চতায় জঙ্গল-ঘেরা প্যারেন গেস্ট হাউসে। আমাদের নামতে দেখে সহাস্য মুখে এগিয়ে এল কেয়ারটেকার প্রকাশ রাই ও তার তিন সঙ্গী। এরাই দু'দিন আমাদের দেখভালের দায়িত্বে। জানলাম, এখন আমরা ছাড়া আর কোনও পর্যটক নেই এখানে। পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর সাজানো-গোছানো চারটি দ্বিশয্যার কটেজ। প্রত্যেক কটেজ সংলগ্ন ব্যালকনি থেকে জঙ্গল দেখা যায়। বাঁ দিকে ডাইনিং রুম আর কটেজের পিছনে একটু উপরে গেস্ট হাউস, কর্মীর ও চালকদের থাকার ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ আছে কাছেই জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সৌজন্যে। সামনে ফুলের বাগান। নীল আকাশ, গাছগাছালি আর পাহাড় নিয়ে এ এক মৌন প্রকৃতি। এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার। যেহেতু প্যারেনে থাকা দু'রাত, তাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার ইচ্ছে আমাদের। উদ্দেশ্য, অলসভাবে কাটানো আর আশপাশে ঘুরে বেড়ানো।

চায়ের অর্ডার দিয়ে ঢুকে পড়লাম কটেজে। দুটো পাশাপাশি কটেজে আমাদের দু'জন করে থাকার ব্যবস্থা। আমাদের সব মালপত্র ওরাই ঘরে পৌঁছে দিল। হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের অপেক্ষায়। ঠান্ডা আছে, তবে যেমনটা হবে আশা করেছিলাম, ততটা কনকনে নয়। সম্ভবত এ বছর জানুয়ারির গোড়ার দিকের পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাব এখানেও ঠান্ডা আটকে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা এল। চা খেয়ে বিছানায় কম্বল ঢাকা দিয়ে আধশোয়া হয়ে কালকে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা শুরু করলাম। এরই মধ্যে প্রকাশ এসে জানিয়ে গেল, অর্ডারমতো আমাদের ডিনার রেডি। রাত ন'টায় ডিনার পরিবেশিত হল। রুটি, মুরগির মাংস আর স্যালাড দিয়ে অসাধারণ খাওয়া হল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল বিহঙ্গকুলের শ্রুতিমধুর বৃন্দগানে। জানলার পর্দা সরাতেই আবিষ্কার করলাম মেঘলা আকাশ আর চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ঠিক আছে, পায়ে হেঁটে এলাচবাগানের মধ্যে দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে ১ কিলোমিটার উপরে যাব ধাওলে ভিউপয়েন্টে। এখান থেকে ভুটান পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখা যায়। কিন্তু বুনো কুয়াশা ভেদ করে কতখানি দৃষ্টি যাবে এবং দেখা গেলেও কতটা ক্যামেরাবন্দি করতে পারব তা নিয়ে সংশয়।

যা-ই হোক, সকাল দশটায় প্রাতরাশ সেরে প্রকাশের সঙ্গে আমরা সংকীর্ণ জঙ্গলের পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। কুয়াশা যেন একটু কমেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর বেশ বোঝা গেল, জংলি পথে চলার রোমাঞ্চই আলাদা। চলার পথে বন্য ফুলের রংবাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের পথে হাঁটতে বেরিয়ে এত সবুজ একদিনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বেলা বেড়ে যাওয়ায় পাখির দেখা বিশেষ পেলাম না। কিন্তু তাদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে আছে বনস্থলী।

পৌঁছে গেলাম ধাওলে। ছাব্বিশ ঘর নেপালি, লেপচা, শেরপার ছোট্ট গ্রাম। এলাচ, আদা আর ফুলঝাড়ু চাষই এদের প্রধান জীবিকা। প্রকাশের পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালাম ভিউপয়েন্টে। প্রকাশের আঙুলনির্দেশে আমরা চোখের সামনে ভুটান পাহাড়ের নিষ্কলুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। জঙ্গলের মাথায় মেঘের ছায়া-মাখা

সূর্যকিরণ আরও রঙিন করে তুলেছে। এই স্মৃতি ক্যামেরায় ভরে একই পথে ফিরে এলাম।

আকাশের মুখ এখনও ভার। একটু তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিয়ে বেলা দুটোয় গাড়িতে উঠে বসলাম। এবার আমাদের গন্তব্য দলগাঁও ভিউপয়েন্ট। ঝালং বাজার ছেড়ে জলঢাকা নদীর উপর ব্রিজ পেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর এসে পড়লাম গৌরীবাস। ছোট্ট একটা জনপদ। এখান থেকে ডান দিকে ৭ কিলোমিটার গেলেই দলগাঁও। অবশ্য এই রাস্তা চলে গিয়েছে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের শেষ প্রান্ত রঙ্গো পর্যন্ত। সময়োচিত সংস্কারের অভাবে রাস্তার হাল বেশ খারাপ। পৌঁছাতে সময় লাগল ঠিক এক ঘন্টা। দলগাঁও পৌঁছে কুড়ি টাকার টিকিট নিয়ে গাড়ি গিয়ে থামল ২৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর প্রায় সমতল একটা খোলা প্রান্তরে। এখান থেকে একটু হেঁটে যেতে হবে ভিউপয়েন্ট। দলগাঁও ভিউপয়েন্ট থেকে সামনে ভুটান পাহাড়ের আরেকটা দিক দেখা যায়। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করতেই বৃষ্টি এল। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ছে। হঠাৎ শুরু হল শিলাবৃষ্টি। সঙ্গে হাওয়ার দাপট। ফিরে এলাম গাড়িতে। দীপক গাড়িটাকে একটা বড় গাছের নিচে দাঁড় করাল, যাতে শিল পড়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ক্ষতি না হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট গাড়িতেই বসে রইলাম এই আশায় যে, শিলাবৃষ্টি থামলে ভিউপয়েন্টে পৌঁছাতে পারব। কিন্তু বৃথাই আশা। শিলাবৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণই নেই। ঠিক করলাম ফিরে যাব।

ফিরতি পথে সারা রাস্তা ছোট-বড় শিল পড়ে সাদা হয়ে রয়েছে। এ এক অভিনব দৃশ্য। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। লেন্সবন্দি করে চলে এলাম ঝালং রিভার ক্যাম্পের সামনে। উদ্দেশ্য গরম চা বা কফি খাওয়া। বৃষ্টির ফলে বেশ শীত-শীত করছে। রিভার ক্যাম্পের সামনেটা শিলাবৃষ্টিতে বরফে ছাওয়া। কিছু পর্যটক বরফ নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। কোনওমতে বরফ পেরিয়ে রিভার ক্যাম্পের ক্যান্টিনে ঢুকলাম। কফি আর পকোড়া খেতে খেতে এইসব মায়াময় দৃশ্য উপভোগ করছি। সন্ধের মুখে ফিরে এলাম কটেজে। আমাদের আজকের মতো যাত্রাবিরতি। নৈশভোজ সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

বেশ ভোরেই উঠেছি। আজ আমাদের প্যারেনে শেষ দিন। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি মেঘ-কুয়াশাহীন পরিষ্কার আবহাওয়া। এটাই পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য। ক্যামেরা নিয়ে বাইরে এসে কটেজের এবং জঙ্গলের প্রচুর ছবি নিলাম। এগুলোই আগামী বেশ কিছুদিন স্মৃতিরোমন্থনে সঙ্গ দেবে।

প্রাতরাশ সেরে ব্যাগপত্র গুছিয়ে প্যারেনকে বিদায় জানিয়ে ধরলাম ফেরার রাস্তা। আজ দীর্ঘ পথ যেতে হবে। ঠিক হল বিন্দু দেখে ফিরব। লোয়ার প্যারেন মোড় থেকে বাঁ দিকে ১১ কিলোমিটার দূরে ভুটান সীমান্তে জলঢাকা নদীর ধারে বিন্দু। পুরো রাস্তার ধারে এলাচ গাছের সারি। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম বিন্দু। জলঢাকা নদীর পাড়ে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। নদীর পূর্ব প্রান্তে ঢেউ খেলানো সবুজ উত্তুঙ্গ ভুটান পাহাড়। জলঢাকা নদীর উপর একটা বাঁধও আছে। আর আছে পথের ধারে চা, কফি ও গরম মোমোর অস্থায়ী দোকান। বাঁ দিকে সেনা ছাউনিও লক্ষ করলাম।

কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা বারোটা। এখন ফিরতে হবে। রাত আটটায় দার্জিলিং মেল। শুরু হল নামা। পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে চাপড়ামারি জঙ্গল ছাড়িয়ে পড়লাম খুনিয়া মোড়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে। ডান দিকে বাঁক নিয়ে সোজা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পথে। মালবাজারে এসে গাড়ি থামল। এখানেই প্রাতরাশের জন্য ঘণ্টাখানেকের বিরতি। মালবাজারের বিখ্যাত বাপির হোটেলে চিতল আর পাবদা মাছ দিয়ে ভূরিভোজনে তৃপ্ত হলাম।

শেষ হল দু'দিনের প্যারেন বেড়ানো। প্রাপ্তির ঘড়া একরকম আশাতীতভাবে ভরে নিয়েই রওনা হলাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের দিকে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি পর্যটনে প্যারেন সত্যিই এক অনবদ্য সংযোজন।

ডা. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

HOTEL GREEN VIEW

Suit AC, Super Delux, AC, Non AC , Conference Hall

HOTEL Green View

Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (0), 9434756733 (M)

সীমান্ত ছিটে ১৫ অগাস্ট উদ্‌যাপন আসলে দুই দেশের স্নায়বিক যুদ্ধ

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিন বঙ্গবন্ধুর শহিদ দিবস পালন আসলে এক প্রতিযোগিতা। সেই সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির দুরভিসন্ধিও বটে। কারণ, এই উপমহাদেশে ভারত ও বাংলাদেশ শুধু প্রতিবেশী নয়, মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ দুই দেশ। উভয় দেশের সুসম্পর্ক এই উপমহাদেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। অথচ বাংলাদেশের ভিতরে পাকিস্তানপন্থী শক্তি প্রতি মুহূর্তে ছলে-বলে-কৌশলে ভারত বিরোধী মননশীলতাকে অত্যন্ত সচেতনভাবে পুষ্ট করে দু'দেশের সুসম্পর্ককে বিনষ্ট করতে সক্রিয়। ছিটমহলগুলিকে ওই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবাধ বিচরণভূমিতে পরিণত করাও ছিল 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি'র মুখ্য উদ্দেশ্য। **সেই কাহিনি নিয়ে এবারের ত্রয়োদশ পর্ব।**

ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করে ভারতের জয়গান কিংবা সে দেশের স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবার পরিণতি যে কী ভয়ংকর হতে পারে তা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেনি দাশিয়ারছড়ার ছিটবাসীরা। কারণ, তারা বছরের পর বছর দেখে এসেছে, ছিটমহল পরিচয়ে আখ্যায়িত গ্রামে স্বশাসিত প্রশাসনিক কর্তারা ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে প্রতি বছর ১৫ আগস্ট উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রে স্বশাসিত প্রশাসনে ছেদ পড়ে। কিন্তু তারা সমষ্টিগতভাবে কালীরহাটে মিয়ান ক্লাবের উদ্যোগে ভারতের পতাকাকে আগলে রাখতে সমর্থ হয়। যথোচিত মর্যাদায় ১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলন করে দিনটি উদ্‌যাপন করেছে। সমবেতভাবে 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীত পরিবেশন করে ভারতপ্রেমের নজিরও গড়েছে। এটা তাদের আবেগ, তাদের দেশাত্মবোধ এবং নিজেদের ভারতবাসী হিসেবে ভাববার একটি স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনে এসেছে যে, তাদের দেশ কোচবিহারের মহারাজা তাঁর রাজ্যটি পাকিস্তানের সঙ্গে নয়, ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তাই তারা ভারতীয়। সরকারিভাবে এই ভূখণ্ড যতক্ষণ ভারতের থাকবে, ততক্ষণ ভারতীয় পরিচয় বহন করাটা নিশ্চয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়? অথচ দাশিয়ারছড়া ছিটবাসীদের এরকমই এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

২০১৪ সালের সেই ঘটনা

স্বাধীনতা দিবস পালনের জোর তৎপরতা চলছে কালীরহাটে। ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের উদ্যোগে সকালে পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরির পর ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই সেখানকার ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের অফিসে সাজো-সাজো রব। চলছে নানাজনকে নানা দায়িত্ব বণ্টনের পালা। কারও দায়িত্বে পতাকা উত্তোলন পর্ব; পতাকার লাঠি কাগজ দিয়ে মুড়ে সাজানো থেকে শুরু করে পতাকা উত্তোলনের জায়গা পরিষ্কার করে চুন দিয়ে সাজানো। কেউ বা প্রভাতফেরি আয়োজনে ব্যস্ত, কারও দায়িত্বে সমষ্টিগতভাবে ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা, আবার কেউ বা ব্যস্ত কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজনে। ছিটবাসীরা চাঁদা তুলে ১৫ আগস্ট দিনটি উদ্‌যাপনে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। অন্য দিকে, বাংলাদেশপন্থী 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি' সচেষ্ট ১৫ অগাস্ট দিনটি অন্যভাবে উদ্‌যাপনে। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রয়াণ দিবস বা শহিদ দিবস হিসেবে দিনটি উদ্‌যাপন করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে। আর সেই উপলক্ষে সমন্বয় সমিতির দপ্তরে শহিদ দিবস পালনের প্রস্তুতিও তুঙ্গে। এ যেন এক প্রতিযোগিতা। একদিকে কালীরহাটে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে শহিদ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ছিটবাসীদের বাংলাদেশি মনস্কতা প্রদর্শনের উদ্যোগ, অন্য দিকে ছিটমহলের ভারতপন্থী ছিটবাসীরা ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ভারতীয় প্রমাণ করতে মরিয়া। এক কথায়, ভারত ও বাংলাদেশের পতাকাকে সামনে রেখে ভারতীয় ছিটমহলের ছিটবাসীদের যেন এক অস্তিত্বের লড়াই। এই লড়াইয়ের প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ, রয়েছে তীব্র উত্তেজনা।

১৪ অগাস্ট ২০১৪

ওইরকম উত্তেজনায় যুক্ত হল এক নতুন পালক। পারদ চড়তে শুরু করল ঊর্ধ্বমুখে। ঠিক সেই সময় ছিটমহলে আবির্ভাব ঘটল বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার পুলিশের। ছিটবাসী মহম্মদ খলিলুদ্দিনের ভাষায়, 'ফুলবাড়ি থানার আমির ও সুকুমার দারোগা ছিটে আসি আমার গুলার হুমকি দিয়া কয়, ছিটে ভারতের পতাকা তোলা যাবে না। পতাকা তুললে লাঠির ডাং দেওয়া হইবে এবং যায় যায় পতাকা তুলবে তাক ছিটের বাইরে যাবার দেব না।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ যেন একেবারেই ভারতীয় ভূখণ্ডে ভারতের পতাকা তুলতে না দেবার ফতোয়া। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাশিয়ারছড়ার ছিটবাসীরা। এ কী বার্তা শুনছে তারা! এ যেন অনেকটা 'একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর' ধরনের ব্যাপার। ভারতীয় ছিটবাসীরা এমনিতেই ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির মুখোশধারী ভূমিদস্যু, মৌলবাদী শক্তি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নানাবিধ ষড়যন্ত্রে জেরবার। তারপর যদি স্থানীয় প্রশাসনের আচরণ এমন হয় তাহলে এই অসহায় মানুষগুলো আর কী করতে পারে?

ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের সদস্যরা এই অবস্থায় জরুরি বৈঠক ডাকে।

তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, তারা স্বাধীনতা দিবসে ভারতের পতাকা উত্তোলন কর্মসূচিতে অনড় থাকবে। বিষয়টি তারা সবিস্তারে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দের গোচরে আনার পরই কোচবিহারে শুরু হয় জোর তৎপরতা। কোচবিহার জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে বিষয়টি দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পর্যন্ত পৌঁছায়। দিল্লির সর্বভারতীয় বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করলে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার স্থানীয় প্রশাসন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দিনহাটা সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডকে সতর্ক করলে তারা রণে ভঙ্গ দেয়।

ভারতীয় ছিটমহল হিসেবে পরিচিত দাশিয়ারছড়ায় ভারতীয় পতাকা তুলতে বাধা দেবার ঘটনায় যারা সক্রিয়ভাবে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের পাশে এসে দাঁড়ান, তাঁরা হলেন কোচবিহারের সাংসদ রেণুকা সিনহা ও দার্জিলিঙের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। তাঁদের দু'জনের আন্তরিক প্রয়াস ছিটবাসীদের বহু সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছে। সেই সঙ্গে ছিটমহল হস্তান্তর পর্বে রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর ভূমিকাও ছিল ইতিবাচক। সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ছিটমহল হস্তান্তর পর্বে ভারতীয় ছিটবাসীদের স্বার্থে যে লড়াই দিয়েছেন তা ইতিহাস স্মরণ করবে। পাশাপাশি ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের আন্দোলনে প্রথম থেকে যাঁরা ধারাবাহিকভাবে অভিভাবকের আসনে থেকে কাউন্সিলের উপদেষ্টা দেবব্রত চাকীকে সহায়তা দান করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সেই সম্মাননীয় বিধায়কদ্বয় দেবপ্রসাদ রায় ও ড. সুখবিলাস বর্মার কাছে ভারতীয় ছিটমহলবাসীরা কৃতজ্ঞ। ২০১২ সালের মার্চ মাসে বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় ছিটমহল সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশদে অবহিত করবার লক্ষ্যে দেবব্রত চাকী লিখিত 'ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত, প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল' গ্রন্থটি প্রদান করেন। এই সমস্ত বিষয় আজ ইতিহাস।

১৫ অগাস্ট ২০১৪

একদা দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভারতভুক্তির মধ্যে দিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ভারতীয় ছিটমহলের অন্যতম দাশিয়ারছড়ায় শেষ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন পর্বটি ছিল ১৫ অগাস্ট ২০১৪। শত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করে অশোকচক্র শোভিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ছিটমহলের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি অধ্যায়। কারণ, দাশিয়ারছড়ায় এটিই শেষ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন বা বলা ভাল, ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলের শেষ স্বাধীনতা দিবস পালন। এর পরবর্তী ইতিহাস ছিটমহল হস্তান্তরের ইতিহাস। ৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাতে ছিটমহলগুলি হস্তান্তরিত হয়ে যায়। ভারতীয় ছিটমহলগুলি বাংলাদেশি ভূখণ্ডে এবং বাংলাদেশি ছিটমহলগুলি পরিণত হয় ভারতীয় ভূখণ্ডে।

ভারতীয় ছিট দাশিয়ারছড়ার অধিবাসীদের ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শত প্রতিকূলতার মধ্যেও একেবারে নির্বিঘ্ন তা বলবার জো নেই। কারণ, যে সময় ছিটমহলবাসীরা 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল'-এর উদ্যোগে ভারতের পতাকা উত্তোলন করে 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীত গাইছে, ঠিক তখন তাদের নাকের ডগায় ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির দপ্তরের সামনে মাইক বাজিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে শহিদ দিবস পালন। কালীরহাটের অদূরে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশি পুলিশের উপস্থিতিতে ও প্রত্যক্ষ নজরদারিতে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে বেলা ১টা পর্যন্ত শহিদ দিবস পালন ছিটবাসী মিজানুর রহমান, মৃণাল বর্মন, গজেন বর্মন, খলিলুর রহমান প্রমুখের ভাষায়— 'আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনকে চ্যালেঞ্জ জানানো ছাড়া আর কিছুই নয়।' মিজানুরের বক্তব্য অনুযায়ী, ছিট ভূখণ্ডে ছিট বিনিময় সমন্বয় সমিতির অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান মইনুল হক-সহ রব্বানী সরকার, গোলাম মোস্তাফা, আলতাফ হোসেন, হানিফ মিঞা প্রমুখের উপস্থিতি ও বক্তব্যদান এক কথায় ভারতপন্থী ছিটবাসীদের ভীতি প্রদর্শনের নামান্তর। সেই সঙ্গে তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কোন কোন ছিটবাসী ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচিতে অংশ নেয়, তার উপর নজরদারি চালানো। এ ক্ষেত্রে শহিদ দিবস উদ্‌যাপন অজুহাত মাত্র। শহিদ দিবস পালনকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসনে বসানোর ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির প্রয়াস এক কথায় বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। সেই সঙ্গে দুরভিসন্ধিমূলকও বটে। কারণ একটা বিষয় এই উপমহাদেশে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ভারত ও বাংলাদেশ— উভয়ই আজ দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। ভারত সর্বদা বাংলাদেশের উন্নয়নে যত্নশীল। উভয় দেশের সুসম্পর্ক এই উপমহাদেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। অথচ বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ পাকিস্তানপন্থী শক্তি প্রতি মুহূর্তে ছলে-বলে-কৌশলে ভারত বিরোধী মননশীলতাকে অত্যন্ত সচেতনভাবে পুষ্ট করে দু'দেশের সুসম্পর্ককে বিনষ্ট করতে সক্রিয়। ছিটমহলগুলিতে এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবাধ বিচরণভূমিতে পরিণত করাই কি ছিল ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য? এই প্রশ্ন আজ খুবই প্রাসঙ্গিক।

দাশিয়ারছড়ায় ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচিকে বানচাল করার যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে ওঠে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্মূল করা, যাতে এই সংগঠনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনও ভারতীয় ছিটমহলবাসী ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবি করতে না পারে। অর্থাৎ ছিটমহলগুলিতে যা হবে তা সম্পূর্ণভাবে তাদের সংগঠনের মাধ্যমেই হবে। এর অন্যথা যাতে না হয়, সেটাই সমন্বয় সমিতির ছিল মূল লক্ষ্য। এক কথায়, ছিটমহল বিনিময় পর্বে কোনও ভারতীয় ছিটমহলবাসী যাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের পক্ষে মতদান করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করাই যেমন ছিল তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, সেরকম পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের কিছু মনোনীত ব্যক্তি বা পরিবারকে ভারতে প্রবেশ করানোও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনও সংগঠন যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে, তার প্রতি ছিল তাদের কড়া নজরদারি। সেই লক্ষ্যেই তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে দাশিয়ারছড়ায় হাঙ্গামা বাধানোর।

এরই মধ্যে ৯ সেপ্টেম্বর '১৪ তারিখে দাশিয়ারছড়ার কালীরহাটে ভারতীয় ছিটবাসীদের সংগঠন ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের শীর্ষনেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন। সেখানে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তথা লালমণিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহলের বাসিন্দা বলরাম বর্মন, তাঁর স্ত্রী তথা সংগঠনের নেত্রী স্বপ্নারানি রায়, সংগঠনের দাশিয়ারছড়া শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান, গজেন বর্মন, মহম্মদ খলিলুদ্দিন-সহ বহু ভারতীয় ছিটবাসী। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় ছিটবাসীদের দীর্ঘ দিনের যন্ত্রণা উপশমের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। ওঁরা জানেন, চরম প্রতিকূলতার মধ্যে একতাই একমাত্র বল।

(ক্রমশ)

দেবব্রত চাকী

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

ড্রাগস, সেক্স, উড, আর্মস আর বর্ডার ক্রাইমের নন্দনকানন হল রূপসি ডুয়ার্স। লাল চন্দন আর নীল ছবির দুনিয়ায় ব্যবসায়ী, রিসর্ট মালিক, রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন ঠিকই, তবে লাটাইটা তো আসলে ধরে রেখেছেন স্থানীয় বিধায়করাই। পুলিশের সহায়তা কতটা মিলছে? নাকি সবটাই নিয়ন্ত্রণ করছে আরও কোনও বড় চাঁই? অন্য দিকে ক্যাটকেটে সাদা চামড়ার ভিডিয়ো ক্রমশই একঘেয়ে হয়ে কোটি কোটি দর্শকের কাছে চাহিদা বাড়াচ্ছে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানি মেয়েদের গোলগাল শরীর। আর সেটাকেই পুঁজি করেছে ডুয়ার্সের ক্রাইম দুনিয়া। শুধু যে পর্ন ছবিতে বেশি টাকার লোভনীয় হাতছানি আছে তা নয়। ডুয়ার্সের মহিলা প্রকল্পে যুক্ত অনেক মেয়ে বাড়তি রোজগারের সুযোগ নিচ্ছে সমাজের উঁচুতলার বহু মানুষের চোখের ইশারা বুঝতে পেরে। উত্তেজক আর রুদ্ধশ্বাস এমন বহু ঘটনার মেলবন্ধনে ফুটে উঠছে অন্ধকার ডুয়ার্সের ছবি।

১৯

জানুয়ারির গোড়ায় এখন ডুয়ার্সে তেড়ে ঠান্ডা পড়েছে। কুয়াশার কারণে আজ সারাদিন রোদ্দুর প্রায় ওঠেইনি। এখন বিকেল চারটের সময় জলপাইগুড়ি শহরের তাপমাত্রা ছয় ডিগ্রির কাছাকাছি। হাড় হিম করা হাওয়া দিচ্ছে একটা। কনক দত্ত আজ দুপুরেই তাঁর অনেক দিনের পরিচিত পরি ঘোষালের ফ্ল্যাটে উঠেছেন গুপ্তবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন বলে। ময়নাগুড়ি থেকে শ্যামল যেই ছেলেটার সঙ্গে গাড়িতে উঠে ক্রান্তির দিকে চলে গিয়েছিল, তাঁর মোবাইল নাম্বারটা ধূপগুড়ি থানায় গুপ্তবাবুকে দিতে চেয়ে ফোন তিনি করেছিলেন সে দিন বিকেলেই। কিন্তু সব শুনে ফোনের ওপার থেকে গুপ্ত বলেছিল, 'আমার তো ট্রান্সফারের অর্ডার এসেছে দাদা। জলপাইগুড়ি ট্রাফিকে। আজ সকালেই জানলাম।'

তারপর একটু নিচু স্বরে জানিয়েছিল, 'তবে আমি নাম্বারটা থেকে ডিটেইল বার করিয়ে নেব। চিন্তা করবেন না। আই ফাউন্ড সামথিং ফিশি! শ্যামলের কেসটা ক্লোজ করে দেওয়ার প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে।'

শুনে কনক দত্ত নিশ্চিত হয়েছিলেন। এর পর কিছুদিন চুপচাপ। সে ক'টা দিন ধূপগুড়িতে নিজের বাড়িতে বসে কেবল ভেবেছেন আর বিস্তর কালো কফি পান করেছেন। বাড়ি থেকে বার হওয়ার দিন ভোর পাঁচটায় কন্যাসাথি এনজিও-র প্রতিনিধিকে দেখা করতে না পারার জন্য ফোন করাটা বেশ অদ্ভুত। সময়টা আরও পরে হলে বাস্তব হত। যে ছেলেটা শ্যামলকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছিল, তার নাম্বার যখন পাওয়া গিয়েছে, আরও তথ্যও পাওয়া যাবে। কিন্তু শ্যামলের সঙ্গে সে ছেলে যোগাযোগ করত কীভাবে? শ্যামলের কল লিস্টে ছেলেটার নাম্বার নেই। তাহলে শ্যামল কি ময়নাগুড়ি যেত বা ছেলেটা ধূপগুড়িতে কোথাও আসত? কাজের ব্যাপারই যদি হয়, তবে ২০ কিলোমিটার দূরত্বে থাকা দুটো ছেলের মধ্যে মোবাইলে কোনও যোগাযোগ নেই... এটা কি খুব বাস্তবসম্মত ব্যাপার?

নানা ভাবনাকোণ থেকে এসব বিচার করে শেষ পর্যন্ত কনক দত্ত অবশ্য কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। অপেক্ষা করছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে গুপ্তর ফোনের জন্য। সেটা পেয়েছিলেন গতকাল বিকেলে। সেই সূত্রেই আজ এই শহরে এসেছেন। পরি ঘোষাল তাঁর প্রায় পঁচিশ বছরের পরিচিত। তিনি গয়েরকাটার ছেলে। দু'বছরের সিনিয়র। কাজ করতেন ডিআইবি-তে। এখন জলপাইগুড়িতে ফ্ল্যাট কিনে বউ আর ডজনখানেক বেড়াল নিয়ে অবসর কাটাচ্ছেন। কনক দত্তর আসার কারণ জেনে কিঞ্চিৎ উত্তেজিতও হয়েছেন পরি ঘোষাল। এই মুহূর্তে চাদর-টুপিতে নিজেকে ঢেকে কনক দত্তর মুখোমুখি একটা চৌকিতে বসে ডুয়ার্সের অন্ধকার দিক নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন।

'ডুয়ার্সের ক্রাইম নিয়ে আমাদের কাছে যা ইনফো আছে তা শুনলে চমকে যাবে দত্ত! ড্রাগস, সেক্স, উড, আর্মস আর বর্ডার ক্রাইমের নন্দনকানন এটা, বুঝলে? আর এর বড় অংশের লাটাইটা এক এমএলের হাতে।'

'কার কথা বলছ পরিদা?'

'বুদ্ধ ব্যানার্জি। নাম তো জানা উচিত তোমার।'

কনক দত্ত হাসলেন। অনেকদিন ধরেই বুদ্ধ ব্যানার্জি নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। দু'-চারবার

কথাও হয়েছে কোনও কোনও মঞ্চে। অমায়িক লোক। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে যে ক'টা অভিযোগ গত বিশ বছরে এসেছে, তার একটাও প্রমাণিত হয়নি। সবাই জানে, ডুয়ার্সের অদৃশ্য 'ডন' হলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। কিন্তু কোথাও তাঁর ছায়ামাত্র জড়িয়ে থাকার কোনও চিহ্ন থাকে না।

'বুদ্ধ ব্যানার্জির গল্প কে না জানে!' কনক দত্ত বললেন। 'রুলিং যার, বুদ্ধ ব্যানার্জি তাঁর। তবে তাঁর উপরেও বাপ আছে দিল্লিতে। সাংঘাতিক অর্গানাইজড একটা দল। কিন্তু আমি যে ব্যাপারে এসেছি, সেটা একটা মিসিং কেস। কিন্তু কিছু একটা চেপে যাওয়া হচ্ছে।'

'মিসিং ছেলেটা মনে হয় না বেঁচে আছে।' পরি ঘোষাল বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন কথাটা। 'সে ক্ষেত্রে তাকে মার্ডার করার কারণ কী?'

'আমারও তা-ই ধারণা পরিদা।' কনক দত্ত অন্যমনস্ক স্বরে বললেন, 'আমার ইন্টিউশন বলছে, শ্যামলের মতো ছেলে ফোন অফ করে লুকিয়ে থাকবে না। বিয়ে-ফিয়ের ব্যাপারটা স্রেফ রটনা। মনে হয় শ্যামল কিছু একটা জেনে ফেলেছিল। তাই তাকে কিডন্যাপ করে রাখা বা মেরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয়টাই বেশি পসিবল।'

আরও কিছুক্ষণ দু'জন আলোচনা করলেন। পাঁচটা বাজার একটু আগে গুপ্তর ফোন এল। কনক দত্তকে তিনি জানালেন যে, দশ মিনিটের মধ্যে ঢুকছেন। সাত মিনিটের মাথায় পরি ঘোষালের ফ্ল্যাটের কলিং বেল বাজল।

'কল লিস্টে একটাই নাম্বার আছে। ওতেই কয়েকটা দিন ধরে ফোন করেছিল ছেলেটি। কিন্তু সিম কার্ড যার নামে, সে একজন কুমোর। নাম নিতাই পাল। বয়স হওয়া উচিত সিক্সটি প্লাস।'

একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে কথাগুলো বললেন গুপ্ত।

'ছেলেটির সঙ্গে নিতাই পালের কানেকশন থাকা উচিত।' পরি ঘোষাল সোজা হয়ে বসে বললেন, 'পালবাবুর বাড়ি কোথায়?'

'সোনারপুরের কাছে। ডিটেইলটা কাগজে আছে। আমি ডিপার্টমেন্টের হেল্প নিয়ে সোনারপুর থেকে খোঁজখবর করাতে পারতাম। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, এই কল লিস্ট বার করার ব্যাপারটাও উপরমহল জেনে গিয়েছে।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামলেন গুপ্ত। তারপর ক্লান্ত স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'এদের জাল সর্বত্র স্যার! দেখুন যদি নিজে একটু ইনফর্মেশন জোগাড় করতে পারেন।'

কনক দত্ত কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, 'নিতাই পালকে মিট করতে হয় তবে। তুমি যাবে নাকি পরিদা আমার সঙ্গে?'

'শিয়োর।' পরি ঘোষাল যেন উৎফুল্ল হলেন। 'এখানে তো উপরওয়ালা বলে কোনও শুয়োরের বাচ্চা নেই!'

গুপ্ত ফ্যাচফ্যাচ করে ফাজিলের মতো হাসল কথাটা শুনে।

'ধূপগুড়ি থানায় কিন্তু শ্যামলের কেসটা ক্লোজড হয়ে গিয়েছে। কারণ, সে বেজাতে বিয়ে করে পলাতক। প্রমাণও নাকি আছে ফাইলে।'

হাসি শেষ করে জানাল গুপ্ত। পাশের সোফায় জার্মান কম্বলের তলা থেকে একটা ধূসর বেড়াল বেরিয়ে এসে দু'বার আড়মোড়া ভাঙল। তারপর গুপ্তর দিকে করুণার দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে।

২০

বাগডোগরা বিমানঘাঁটি থেকে গাড়িটা বেরিয়ে খানিকক্ষণ শিলিগুড়ির জ্যামজটমুখরিত রাস্তায় হামাগুড়ি দেওয়ার পর বাস টার্মিনাসের সামনে এসে গতি তোলার ফুরসত পেল। গাড়িটার নাম্বার নেপালের। সাদা হন্ডা সিটি। নেপালি ড্রাইভারের পিছনে নবীন রাই মোবাইলে কিছু স্টিল ছবি দেখাচ্ছিল দাসবাবুকে। তিন-চারজন মেয়ের ডজনকয়েক খুল্লমখুল্লা ফোটো। জামাকাপড় থাকার কোনও প্রশ্নই নেই।

'হু ইজ দ্য বেস্ট দাসবাবু?'

ছবিগুলি কয়েকবার দেখিয়ে আলতো স্বরে প্রশ্নটা করল নবীন রাই। দাসবাবু উত্তরে বললেন, 'এরা সব কি লোকাল?'

'থ্রি ফ্রম শিলিগোড়ি অ্যান্ড ওয়ান ফ্রম জলপাই। অল আর বেংগালিজ। ফ্রেশ অ্যান্ড ডেলিশাস!'

'এই মেয়েটা তো মার্কেট জমিয়ে দেবে!'

দাসবাবু ফোনটা নিয়ে একজনের ফোটোগুলো আবার দেখতে দেখতে বললেন। নবীন রাই তারিফের সুরে বললেন, 'আপনার চয়েস আছে দাদা! শি ইজ দ্য বেস্ট। ওকে নিয়ে একটা মুভি শুট হয়ে গিয়েছে। ছেলেটা নেদারল্যান্ডসের। ক্লিপিংস দেখবেন দাদা?'

'দরকার নেই। মেয়েটার নামটা কী?'

'মুভির টাইটেলে আছে কামদেবী। অরিজিনাল নেম মনামি। আমার মনে হয়, দিস গার্ল ইজ গোয়িং টু বি আ পর্ন কুইন।'

আকাশবাণী শিলিগুড়ি ভবনের খানিক আগে একটা গলিপথে গাড়িটা ঢুকে থেমে গেল গাড়িটা। এখানেই নবীন রাইয়ের শিলিগুড়ির আস্তানা। ১৬০০ স্কোয়্যার ফুটের ফ্ল্যাট।

'আসুন দাসবাবু। দিস ইজ মাই ফ্ল্যাট অ্যান্ড স্টুডিয়ো।'

পর্ন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা লাগানোর আগে দাসবাবুকে সব বুঝে নিতে হবে। দিল্লি এ ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছে। এ দেশে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ আইনসিদ্ধ নয় এখনও। ধরা পড়লে ঝামেলা আছে। মেয়েরা ঘাবড়ে যাবে। তবে কাজ বলতে ছবি তুলে বাইরের ক্লায়েন্টকে বেচে দেওয়া। ক্লায়েন্টরাই সেসব সাজিয়ে-গুছিয়ে আপলোড করে দেবে নিজেদের সাইটে। ইন্ডিয়ান পর্নোগ্রাফির চাহিদা প্রতিদিনই বাড়ছে গোটা বিশ্বে। ক্যাটকেটে সাদা চামড়ার সেক্স দেখতে দেখতে কোটি কোটি দর্শকের চোখে ছাতা পড়ে যাচ্ছে। বাজারে তাই ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মেয়েদের চাহিদা সাংঘাতিক। দেখতে ভাল হলে তো কথাই নেই। অবশ্য নায়করা দেশি হলে চলবে না। সেখানে সাদা চামড়া মাস্ট। নবীন রাই একজন বাংলাদেশি মেয়ের কথা বলেছিল। তার নাম রাবেয়া। এক কাপড় ব্যবসায়ী তাকে নিয়মিত ধর্ষণ করত। দেশ থেকে রাবেয়া পালিয়ে গিয়ে পাকেচক্রে এসে পড়েছিল নবীন রাইয়ের এজেন্টের হাতে। মাসকয়েক নিজের খরচে ভালমন্দ খাইয়ে রাবেয়ার চেহারায় লালিত্য এনে দিয়েছিল নবীন রাই। তারপর ট্রেনিং দিয়ে একটা ছবি বানায় এই ফ্ল্যাটেই।

সেটা দু'বছর আগের কথা। রাবেয়া এখন মুম্বইতে। তার এখন নিজের গাড়ি আর ফ্ল্যাট আছে। জার্মানির একটা পর্ন সাইট তাকে কিনে নিয়েছে। রাবেয়ার কোনও ভিডিয়োতে দশ মিলিয়নের নিচে লাইক নেই। পর্ন অস্কারের নমিনিতেও আছে নাকি এ বছর।

রাবেয়াকে রিলিজ করে নবীন রাই প্রায় দেড় কোটি নেপালি টাকা পেয়েছিল। শুনে দাসবাবুর মনে হয়েছিল যে, এক অনন্ত সম্ভাবনার দরজা খুলে যাচ্ছে তাঁর সামনে। মিনিমাম রিস্ক। ম্যাক্সিমাম রিটার্ন। বুদ্ধ ব্যানার্জিকে এই জন্যই মানতে ইচ্ছে করে তাঁর। নবীন রাইয়ের মতো লোক সঙ্গে থাকা মানে নেপালেও অনায়াসে কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে।

পর্ন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা লাগানোর আগে দাসবাবুকে সব বুঝে নিতে হবে। দিল্লি এ ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছে। এ দেশে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ আইনসিদ্ধ নয় এখনও। ধরা পড়লে ঝামেলা আছে। মেয়েরা ঘাবড়ে যাবে। তবে কাজ বলতে ছবি তুলে বাইরের ক্লায়েন্টকে বেচে দেওয়া। ক্লায়েন্টরাই সেসব সাজিয়ে-গুছিয়ে আপলোড করে দেবে নিজেদের সাইটে। ইন্ডিয়ান পর্নোগ্রাফির চাহিদা প্রতিদিনই বাড়ছে গোটা বিশ্বে।

ফ্ল্যাট থার্ড ফ্লোরে। বেল টিপতেই একজন মাঝবয়সি নেপালি মহিলা দরজা খুলে দিল। এখানেই আজ কয়েকজনের সঙ্গে মিটিং করবেন দাসবাবু। তাঁদের মধ্যে আছেন কে শিবচন্দ্র। দক্ষিণ ভারতীয় পর্ন ফিল্মের বিরাট কারবারি। তবে সকলের মূল চাহিদা হল বাংলাদেশ। সেখানে পর্ন মেকিং-এর কোয়ালিটি খুব বাজে। দাসবাবু বুঝেছেন যে, তাঁর দরকার হচ্ছে বাংলাদেশের জন্যই। নবীন রাই আর লোকজনদের কাছে বাংলাদেশের রাস্তা তিনিই খুলে দিতে পারেন। তা ছাড়া তিনি নিজে মেয়েদের ব্যাপারে মোক্ষ লাভ করে গিয়েছেন। শক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মলিঙ্গে বেজায় আলিস্যি। বয়সকালে ভিডিয়ো ক্যাসেট জোগাড় করে যে দেখতেন না তা নয়, কিন্তু সেটাই যে ডিজিটাল যুগে এসে তাঁকে কালো ধান্দার নতুন দিগন্ত দেখাবে, সেটা কখনওই ভাবেননি। গরম কফি খেয়ে আধ ঘণ্টা নবীন রাইয়ের সঙ্গে গল্প করে আরও জরুরি তথ্য নিয়ে নিলেন দাসবাবু। স্টুডিয়ো দেখলেন। দুর্ধর্ষ সাজানো একটা ঘর। দুটো লাইট আর ক্যামেরা। ঘরের সব চাইতে সেরা জিনিসটা হল পেল্লায় একটা বিছানা। ফটফটে সাদা। দেখেই দাসবাবুর একটু ঘুম-ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। এর পর এলেন কে শিবচন্দ্র। সাড়ে পাঁচ ফুট হাইটের মানুষটির সঙ্গে দাসবাবু পাবনার রফিকুল ইসলামের কোনও তফাত দেখলেন না। দক্ষিণী আর বাঙালি চেহারায় দারুণ মিল।

'ওয়েলকাম টু আওয়ার সেক্স ইন্ডাস্ট্রি। সেক্সউড ইজ মোর এক্সাইটিং দ্যান হলিউড অর বলিউড!' আলতো হেসে আলাপ করলেন কে শিবচন্দ্র।

'হোয়াট'স ইয়োর অ্যাডভাইস?'

'সিম্পল।' দাসবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরটা এল নবীন রাইয়ের মুখ থেকে— 'এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা হিরোইন, তাদের প্রস ভাবলে চলবে না। শি ডাজ নট মেক লাভ উইথ হার হিরো, বাট অ্যাক্টস।'

'রাইট।' শিবচন্দ্র মাথা নাড়েন।

২১

বাইরের আবহাওয়ার মতো এখন যেন নবেন্দু মল্লিকের জীবনেও পৌষ মাস। ক্রমাগত ভাল খবর আসছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা রাজ্য ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটির সদস্যপদ পাচ্ছেন তিনি। পাকা খবর। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী দাঁড়াবে না। দক্ষিণবঙ্গের এক ডাকসাইটে নেতা এর মধ্যেই ডুয়ার্সে আসছেন তাঁর নির্মীয়মাণ রিসর্টটির তদারকির জন্য। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, একটা ভাল জমি পাইয়ে দেবেন প্রায় জলের দরে। ফলে নবেন্দু মল্লিক কয়েক দিন হল খুব দামি সিগারেট খাচ্ছেন। হন্ডা সিটির দাম কত এবং তা পুষতে কী খরচা, সে খবর জানার জন্য শিলিগুড়িতে কয়েকবার ফোনও করে ফেলেছেন। সে গাড়ি আপাতত কেনা যাচ্ছে না, তবে ভবিষ্যতে কেনার দুর্দান্ত সম্ভাবনা। ব্লক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বটা আবার ফিরে পেলেই লাইনটা খুলে যাবে হন্ডা সিটির।

তেড়ে শীত চলছে দু'দিন ধরে। গতকাল নিজের ঘরে স্কচ সেবন করার পর লেপের নিচে যাওয়ার সময় শুক্লা দাসের কথা খুব মনে পড়ছিল নবেন্দু মল্লিকের। কত উষ্ণতা সে শরীরে। তখনই ঠিক করে রেখেছিল যে, পরদিন দুপুর নাগাদ কন্যাসাথির অফিসে যাবে। চা খাবে। বুকের খাঁজ দেখবে। হাত বোলাবে। এইসব কারণেই আজ দুপুর একটা নাগাদ রয়্যাল এনফিল্ডে ধুক ধুক শব্দ তুলে, দাড়ি কামিয়ে, লেদার জ্যাকেটের উপর বডি স্প্রে ছড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নবেন্দু মল্লিক। কন্যাসাথির অফিস আজ চমৎকারভাবে ফাঁকা। কিন্তু শুক্লা দাস শাড়ির উপর একটা মোটা সোয়েটার পরে যেভাবে কানে মাফলার জড়িয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন, তাতে বুকটাই প্রায় অদৃশ্য হয়ে ছিল। বাধ্য হয়ে বাইক দাঁড় করিয়ে নবেন্দু মল্লিককে বলতে হল, 'শীতটা খুব পড়েছে, না?'

'আসেন দাদা!' শুক্লা দাসের মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'দিদিরা তো কেউ নাই। সার্ভের কাজে হুসলু ডাঙ্গা গ্যাসে।'

'সে কী! সকালে যখন ফোন করলাম, তখন তো বললে থাকবে!'

'থাকার কোনও ঠিক আসে? আসেন। এই তো বাইর হল।'

'দেরি হবে?'

'বিকেল তো হবেই। ভিতরে আসেন। চা খায়ে যান। এই ঠান্ডায় গরম জিনিস ভাল লাগবে।'

'আসব?'

'আসেন না! আপনারই তো বাড়ি। একটু দ্যাখেন ঠিকঠাক আসে কি না। ভাড়া দিসেন বলে কর্তব্য শেষ?'

নবেন্দু মল্লিক ঢুকে পড়লেন। বারান্দা, ঘর, ভিতরের বারান্দা পেরিয়ে পিছনে খানিকটা উঠোন। গাছপালায় ঘেরা। একটা কুল গাছ ভরে আছে সবুজ-হলুদ ফলে। উঠোনে বেশ বড় একটা কালো পলিথিন শিট পরিপাটি করে বিছিয়ে রাখা।

'পলিথিন দিয়ে কী করছেন?'

'ভাবসিলাম রোদে দিব। রোদই নাই আজকে। এই ঘরে আসেন।'

পর্দা সরিয়ে একটা ছোট ঘরে তাঁকে নিয়ে এল শুক্লা দাস। ঘরের কোনায় ছোট একটা টেবিলে স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম। এর বাইরে আসবাব বলতে একটা কাঠের বেঞ্চি। সেটা দেখিয়ে শুক্লা দাস বলল, 'বসেন। ঘরে অতটা ঠান্ডা নাই।'

শুক্লা দাস মাফলারটা খুলে ফেলল। তারপর নবেন্দু মল্লিকের দিকে পিঠ দিয়ে সোয়েটারটা খুলতে খুলতে বলল, 'গরমই লাগতেসে বুঝলেন? সোয়েটারটা খুইলে চা বানাই।'

নবেন্দু মল্লিকের গলা উত্তেজনায় শুকিয়ে গেল। সোয়েটারটা বেঞ্চিতে ছুড়ে দিয়ে শুক্লা দাস তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কেবল শাড়ি-ব্লাউজ পরা এই দেহটাকে এবার বেশ আপন বলে মনে হচ্ছিল নবেন্দু মল্লিকের। অবশ্য শুক্লা দাসের চোখ দেয়ালের দিকে। কিছুটা উদাসীনভাবে চুলের খোঁপাটা ঠিক করতে করতে সে বলল, 'সে দিন চা খাওয়ানোর আগেই চলে গেলেন। খারাপ লাগসিলো। আপনার কি সংকোচ হয়?'

'সংকোচ?'

'মনে তো হয় সংকোচ হয়।' খোঁপা ঠিক করে নবেন্দু মল্লিকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল সে, 'আরে আপনি হলেন নামী লোক। আমার দিকে ভাল করে তাকালে তো আমারই ভাল। তাকান না! দ্যাখেন!'

টুপ করে আঁচল খসে গেল। নবেন্দু মল্লিক বাস্তবে এতটা আশা করেননি। ভেবেছিলেন তাঁকেই আচমকা ঠেসে ধরতে হবে শরীরটা। কিন্তু বিপরীত পক্ষের সক্রিয়তা তাঁকে একটু ঘাবড়ে দিল। ততক্ষণে শুক্লা দাস দু'পা খানিকটা ঝুঁকে বেঞ্চিতে বসে থাকা নবেন্দু মল্লিকের নাকের কাছে নিজের নাকটা প্রায় ছুঁইয়ে দিয়েছে। এখন ঠোঁট বাড়ালেই বুক।

'চা ভাইবা আমারেই চুমুক দ্যান কয়েকটা।'

খুব আনাড়ির মতো নারীটিকে কোলের উপর বসিয়ে নবেন্দু মল্লিক চপ চপ করে কয়েকটা চুমু খেলেন। তারপর রোমান্টিক নায়কের মতো শুক্লা দাসকে জাপটে ধরে বললেন, 'আর পারি না সোনামুনু!'

'আজ বাইরে থেকে খান। পরদিন কন্ডোম নিয়ে আসবেন। গন্ধওয়ালা কন্ডোম।'

ধেড়ে শিশুর মতো শুক্লা দাসকে টেপাটেপি করতে লাগলেন নবেন্দু মল্লিক। সস্তা কাঠের বেঞ্চিটা দু'-একবার কুই কুই করে উঠল। শুক্লা দাস ব্লাউজ খোলা পর্যন্ত 'অ্যালাও' করে বলল, 'বাকিটা এখন খুইলেন না। পরশু আসেন। আমার নাম্বারটা নিয়া যাবেন।'

শুক্লা দাসের ঊরু টিপতে টিপতে নবেন্দু মল্লিক বললেন, 'আসব। শুধু কন্ডোম না, উত্থান তেলও নিয়ে আসব সোনামুনু।'

বাইরে তখন শীতল দুপুরের মৃত আলো। ভিতরের উঠোনে পড়ে থাকা কালো পলিথিনের বুকে ক্রমশ ঠান্ডা জমছিল তখন। ডুয়ার্সের আকাশে-বাতাসে এখন পৌষের সদম্ভ উপস্থিতি। সত্যিই কি সর্বনাশ ডেকে আনে পৌষ মাস?

(ক্রমশ)

দেবপ্রসাদ রায়

আলিপুরদুয়ারে জ্যোতি বসুর সভা পণ্ড করার জন্য বন্‌ধ ডাকার পরিকল্পনা, তা নিয়ে প্যারোডি গান লেখা, বান্ধবীর বাড়ির দরজা থেকে তার দাদুর গলাধাক্কা— যৌবনের এসব কথা বলেন নির্দ্বিধায়। পরবর্তীতে কংগ্রেস দল ভাগ হয়ে যাওয়ার পরও নিজের ও অন্য দলের বহু মানুষের দর্শন ও ব্যক্তিজীবনে আকৃষ্ট হয়েছেন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাজনীতির মঞ্চে সেসব অভিজ্ঞতা কাজেও লাগিয়েছেন। কিন্তু তার থেকে বড় কথা, ফেলে আসা অতীতের মানুষ ও ঘটনাবলিকে আজও স্মৃতির আশ্চর্য পটে দেখতে পাওয়া। জীবনধারাভাষ্যে সেইসব মানুষ ও ঘটনা ঘুরে-ফিরে আসছে ডুয়ার্স থেকে রাজধানী পথপরিক্রমায়।

৭

এই কঠিন সময়ে দলের পক্ষ থেকে প্রথম যে শহিদ হয়েছিল, তার নাম বিপুল। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দলের একটা সভা ছিল। সভার স্থলের পিছনে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যার প্রতিবাদে প্রিয়দা রাজ্য জুড়ে 'প্রতিবাদ কর্মসূচি'র ডাক দিয়েছিলেন। এসব অবশ্য সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের আগের বছরের কথা। '৬৯-এর ১১ এপ্রিল জ্যোতি বসু আলিপুরদুয়ারে সভা করতে এসেছিলেন, আর ছাত্র পরিষদ যে সেই দিন 'বন্‌ধ' ডেকে সভা পণ্ড করে দিয়েছিল, তা আগেই বলেছি। এই ঘটনার প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এবং জ্যোতি বসুর সভা হলেই বন্‌ধ ডাকার রেওয়াজ যে চালু হয়ে গিয়েছিল, সে কথাও জানেন আপনারা। ওই সময়ে আমি একটা প্যারোডি লিখি। সেটা ছিল—

মনে পড়ে জ্যোতিদা একদিন তোমাকে
সকলেই নেতা বলে মেনেছি
আজ হায় জ্যোতিদা যেখানেই গিয়েছ
হরতাল কেন হতে দেখেছি?

বুঝতেই পারছেন, আর ডি বর্মনের সুপারহিট গান 'মনে পড়ে রুবি রায়'-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত। সন-তারিখ হুবহু মনে নেই। কিন্তু সেই সময়টাতেই জলপাইগুড়িতে কংগ্রেস ভবনে আমরা 'উত্তরবঙ্গ' ছাত্র পরিষদের সম্মেলন ডাকলাম। দিনহাটা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ ইত্যাদি প্রায় সব জায়গা থেকেই ভাল সংখ্যক প্রতিনিধি হাজির ছিল সে সম্মেলনে। হিসেব করে দেখেছিলাম যে, আমরা স্থানীয়রাই সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছি। যে দিন সম্মেলন, সে দিন রাতে খবর এল, ইন্দিরাজি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছেন। সম্ভবত তখন কংগ্রেসের ব্যাঙ্গালোর অধিবেশন চলছিল এবং অধিবেশনের মঞ্চ থেকেই এ কথা ঘোষণা করেছিলেন ইন্দিরাজি। এ নিয়ে মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাত চলছিল কিছুদিন ধরে। মোরারজি দেশাই ছিলেন ব্যাঙ্কের সামাজিকীকরণের পক্ষে।

এসব সত্ত্বেও রাজ্যে কংগ্রেস মোটামুটি পর্যুদস্ত। নেতৃত্বরা সব অনুপস্থিত। যা করছে, একা ছাত্র পরিষদ। প্রিয়দা তখন চুটিয়ে ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সঙ্গে সুব্রত (মুখোপাধ্যায়), মালদার অসিত বসু প্রমুখ। ওদিকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হঠাৎ হঠাৎ সমাজবাদী ভাবধারার কথা উচ্চারিত হচ্ছে মোহন ধারিয়া, চন্দ্রশেখর, শীলভদ্র জাজি, অমৃত নাহাটা, অর্জুন অরোরা... এঁদের বক্তব্যে। আমরা পত্রপত্রিকা পড়ে বুঝতে পারছি যে, তাঁদের পিছনে ইন্দিরাজির প্রচ্ছন্ন সমর্থনও আছে। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে একটা র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটছিল এবং সেটা আমাদের খুব উৎসাহিতও করছিল তখন।

'৬৫-তে আমরা যখন জলপাইগুড়ি এসি কলেজে চুটিয়ে ছাত্র পরিষদ করছিলাম, তখন সমকালীন বাম-নেতারা এটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন যে, আমাদের ছাত্র পরিষদ করার এক এবং একমাত্র মোটিভ হল শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে ভাল কেরিয়ার গঠন করা। পাহাড়ি পাড়ায় আমার এক বান্ধবী থাকত। পলিটিক্যাল সায়েন্সের অনার্সে তখন কলেজে আমি ছাড়া বাকি সবাই ছাত্রী। রাজনীতি করে সময় চলে যেত বলে ক্লাস মিস হত খুব। নোটসও পেতাম না। পরে বান্ধবীদের কাছ থেকে নোটস জোগাড় করে নিতাম।

বান্ধবীর নাম ছিল বনানী। বেলঘরিয়ার মেয়ে। পাহাড়ি পাড়ায় মামার বাড়িতে থেকে পড়ত। আমি নোটস আনতে বনানীর বাড়িতে গিয়েছি একদিন। বারান্দায় বনানীর দাদু বসে ছিলেন। আমায় দেখে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বনার সঙ্গে পড়ো?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা ইউনিয়ন-টিউনিয়ন কিছু করো না কলেজে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছাত্র পরিষদ করি।'

'কী বললে? ছাত্র পরিষদ? অ্যাঁ! ছাত্র পরিষদ করো? নামো! আমার বারান্দা থেকে শিগগির নামো!!' প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বললেন দাদু।

এইরকম আরেকটা স্মৃতি মনে পড়ছে। জলপাইগুড়িতে আমি গোরা নন্দীদের বাড়িতে থাকতাম। একটা মিছিলের কথা আগে লিখেছি, যেখানে বক্তৃতা শুরু করামাত্র অরুণাংশু ভৌমিকের মাথায় আধলা ইট এসে অবতরণ করেছিল। সেই মিছিলের পরদিন আমি গ্রন্থ ভারতীতে আড্ডা মারার জন্য এসেছি। সেখানে গোরা নন্দীও আড্ডা দিতেন। তিনি তখন ছিলেন। বামপন্থী গোরা নন্দী

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সংবাদ সে রাতে পাওয়ার পর একটা ট্রাক জোগাড় করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মীদের তুলে নিয়ে শহরে ঘুরে ঘুরে একটা মিছিল করেছিলাম আমরা সেই রাতেই। মনে আছে যে, সে দিন রাতে সবার মনেপ্রাণে প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

আমাকে আসতে দেখে কাছে থাকা লোকটিকে বেশ জোরেই বললেন (যাতে আমি শুনতে পাই), 'কালকের মিছিলে যারা ছিল, তাদের দেখলে আমি নাকে রুমাল দিই। এরা সব পূতিগন্ধময় চরিত্র।'

বলা বাহুল্য যে, কাঁচা বয়সে এসব খুব মনে লাগত। তাই কংগ্রেসের মধ্যে যখন সমাজবাদী কর্মসূচির কথা উচ্চারিত হতে শুরু করল, তখন তা আমাকে একটা 'স্টিগমা' থেকে বার করে আনতে সাহায্য করে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, 'ব্যক্তি আমি' রাজনৈতিকভাবে তেমন কিছু করতে না পারলেও এর ফলে আমার সামাজিক উত্তরণ ঘটবে। নিজের রাজনীতি করার যৌক্তিকতাকেও অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। স্রেফ একটা চাকরি বা খানিকটা কেরিয়ার গঠনের জন্য রাজনীতি করতে আসিনি, তা মানুষের কাছে প্রমাণ করতে পারব।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সংবাদ সে রাতে পাওয়ার পর একটা ট্রাক জোগাড় করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মীদের তুলে নিয়ে শহরে ঘুরে ঘুরে একটা মিছিল করেছিলাম আমরা সেই রাতেই। মনে আছে যে, সে দিন রাতে সবার মনেপ্রাণে প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনা। এর পরপরই খবর এল, ইন্দিরাজি রাজন্য ভাতা বিলোপ করে দিয়েছেন। কিন্তু এবার বাদ সাধল সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে ভাতা বিলোপ 'অবৈধ' বলে ঘোষিত হল। ক'দিন পরেই কলকাতা থেকে প্রিয়দা পাঠালেন কিছু পোস্টার। তাতে লেখা— পঞ্চাশ কোটি মানুষের জয়যাত্রা আদালত স্তব্ধ করতে পারবে না।

খুব উৎসাহে সে পোস্টার শহরময় লাগালাম আমি।

'৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ হয়ে গেল। ইন্দিরা কংগ্রেস সমাজবাদী এবং প্রগতিশীল কর্মসূচি একের পর এক গ্রহণ করতে শুরু করল। পাশাপাশি এ রাজ্যে দানা বাঁধতে লাগল নকশালদের কর্মসূচি। দেখা গেল, অচিরেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমি যে স্কুলে তখন পড়াতাম, তার প্রধান শিক্ষক ছিল অধীর চক্রবর্তী। অধীর অবশ্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিল। মোহিতনগরের বাসিন্দা অধীর ছিল নকশালবাড়ি রাজনীতির একজন উগ্র সমর্থক। আমি কংগ্রেস রাজনীতি করতাম বলে অবশ্য ও আমাকে 'শ্রেণিশত্রু' ভাবত না। ওর বাড়িতে বহু আড্ডায় আমাকে নিজের মনের কথাগুলো খুলে বলত। অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, এক্সট্রিমিস্ট রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁরা বিপরীত মতবাদের মানুষের কাছে মনের ধ্যানধারণা খুলে বলেন না। কিন্তু অধীর ছিল ব্যতিক্রম।

অধীর এক সময় বেশ কিছুদিনের জন্য স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল। কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তারপর একদিন ফিরেও এল আবার। তখন স্কুল পরিচালন কমিটি 'অনুমতি ছাড়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিত' থাকাকে বিষয় করে মিটিং ডাকল একটা। সন্ধেবেলায় মিটিং। সেখানে অধীরকেও উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা মিটিং-এ বেশ কায়দা করে এই বিষয়টা খাড়া করল যে, অনুমতি ছাড়া এতদিন অনুপস্থিত থেকে অধীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। সব শুনে অধীর বলল, 'এত জটিল করে বলার দরকার নেই। আপনারা আমাকে বরখাস্ত করতে চান, কিন্তু সেটা বলতে ভয় পাচ্ছেন তা-ই তো? ভয় নেই। আমি আসলে চাকরি ছাড়তেই আজ এখানে এসেছি।'

আমি ওকে বলেছিলাম, 'স্কুল করেও তো রাজনীতি করা যায়। তুই কেন চাকরি ছাড়ছিস?'

ও একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'তুই হয়ত বিশ্বাস করবি না মিঠু! কিন্তু সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মা যখন চা দেয়, তখন মনে হয় যে, কাল গ্রামের যে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে এলাম, তারা তো কেউ চা খায় না। কেউ দেয়ই না ওদের চা! এটা ভাবলেই মনে হয় চায়ের কাপটা ছুড়ে ফেলি।'

এর বছরখানেক পর আমি ধূপগুড়িতে গিয়েছি দলের কী একটা কাজে। ফেরার সময় বাসের অপেক্ষায় মোড়ের সেই বট গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম অধীর একটা ট্রাক থেকে নামল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কী রে অধীর! তুই?'

'আমায় যে দেখলি তা কাউকে বলিস না।' অধীর আমাকে বলল।

আমি ওকে সিংজির দোকানে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি আর শিঙাড়া খাওয়ালাম। এর কিছুদিন পরে খবর পাই, ধূপগুড়ির কালীরহাটে কোনও এক গোপন ডেরা থেকে রাতে মিটিং করে ফেরার সময় ওকে ডাকাত সন্দেহে গ্রামবাসীরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

(ক্রমশ)

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

এখন ডুয়ার্স-এর উদ্যোগে এরকমই একটি অভূতপূর্ব সংকলন প্রকাশিত হবে আগামী জুন মাসে। এই অঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত কবিদের নিজস্ব বাছাই কবিতাগুচ্ছ থাকছে এই সংকলনে। স্বভাবতই কলেবরে আয়তনে দশাসই হবে বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্সের যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের সবার কাছে আহ্বান রইল এই সংকলনে কবিতা সহ যোগ দেওয়ার। কবিতায় ডুয়ার্স ভূখণ্ডের উপস্থিতি কাম্য। প্রত্যেকে তাঁর সেরা কুড়িটি কবিতা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) বাছাই করে টাইপ করে পিডিএফ ফরম্যাটে মেল করুন ekhonduars.sahitya@gmail.com কিংবা হাতে বা ডাকযোগে হলে পাঠান 'এখন ডুয়ার্স'-এর ডুয়ার্স ব্যুরো অফিসে। (মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি) আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন করুন অমিতকে (৯৬৪৭৭৮০৭৯২) বা শুভ্রকে (৯৪৭৫৫০৩৩৪৮)। কবিতা পাঠাবার শেষ তারিখ এপ্রিল ৩০, ২০১৬।

নুন-বুক আর রক্ত মাদার

গাছগুলো নেতিয়ে পড়েছে। ওদের সময় শেষ। চৈত্র শুরুর তপ্ত দিনে খেতেরও যেন ঘাম ঝরছে। বড় বড় শ্বাস ফেলছে দুপুর। একটু জিরিয়ে নিচ্ছে ফুলমণি ওঁরাও। ধুলো আর ঘাম লেপটে তার যুবতী শরীর লবণাক্ত। ফুলমণির মনে পড়ে, ছাদ ঢালাইয়ের কাজে সেবার গিয়েছিল ধূপগুড়ি। আরও অনেকেই গিয়েছিল। কী-ই বা করবে? বন্ধ বাগানের গেট। ফ্যাক্টরির হুইস্‌ল কতদিন বাজে না। আনাড়ি শরীর নিতে পারছিল না বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে অত উপরে ওঠা। পা কাঁপছিল। শরীর টলমল। এমন দুপুরে আধ ঘণ্টার অবসরে যখন সবাই চিঁড়ে-গুড় খাচ্ছে, ফুলমণি তখন হাঁপাচ্ছিল। নতুন তৈরি হতে থাকা বাড়িটার নীচতলার এক নির্জন কোণে ছায়া খুঁজে নিয়েছিল সে। আর তখনই ব্যাপারটা ঘটল। চা-বাগানেরই বীরমন। এক নিমেষে কোথা এসে তাকে জাপটে দেয়ালে ঠেসে ধরল। জামা তুলে কী তুলকালাম, বুকে দাগ বসাতে বসাতে বলে উঠল, 'নুন দিয়ে স্নান করেছিস নাকি রে!'

বিষয়টা তার কাছে নতুন না। বাবা হাড়িয়ায় চুর হয়ে রাস্তাঘাটে প্রায়শই পড়ে থাকে। মা তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল শরীর। সে দেখত তাদের ঘরে কী সব ঘটছে। ম্যানেজারবাবু চলে যাবার পর মায়ের সেই চেকনাই কমে গিয়েছিল। তবে দমে যায়নি মা। ক'দিন বিষণ্ণ। পোশাকে ময়লা পড়ল। সেই যে টিপটপ থাকা, তা ক'দিন মার খেল। তবু মায়ের হাসিটাকে হিংসে করত ফুলমণি। মুখটা যেন পাথর-খোদাই। চোখ দুটোর দিকে তাকালে মেয়েরাই বিবশ। ছেলেরা তো মরবেই। কিন্তু মা কীভাবে ফরসা হল? চোখ-মুখগুলো কেন অন্যদের চেয়ে আলাদা? বাগানের বীরসা বুড়ো পুরোটা বলেনি, তবে ইঙ্গিত দিয়েছিল। একটা গল্প শুনিয়েছিল।

—জানিস, ইউরোপিয়ান সাহেব-ব্যাটারা কম জ্বালায়নি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই হয়ে গেল। ম্যানেজারের বাংলোতে তাকে কাজে যেতেই হবে, নইলে বিপদ। সেটা আবার ছিল এক সুরক্ষিত দুর্গ। বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না। শুধুমাত্র অন্য বাগানের ম্যানেজাররা কখনও সখনও। আর চাকরবাকর যারা থাকত, তারা সব ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। সাহেবকে খুশি না রাখলে অবস্থা টাইট! ওই প্রাসাদের মখমল বিছানায় একবার শুলে আর কোথাও ভাল লাগবে? তোর দিদা খুব সুন্দরী ছিল। কালো, কিন্তু চেহারায় হীরে-জহরত চমকাত!

খেতের ধুলোবালি লেগে আছে ফুলমণির মধ্যভাঁজে। সে নিজের দিকে তাকাল। বুকের দিকে। তার গায়েও কি ইউরোপিয়ান রক্ত?

খেত যেন আর গর্ভে রাখতে পারছে না। এক রাজবংশী পুরুষ সোজা সোজা লাইনে লাঙল টানছে। ফুলমণি একবার খেত আর একবার সেই পুরুষের দিকে তাকায়। ফালা ফালা হচ্ছে খেত। আর বেরিয়ে আসছে শয়ে শয়ে আলু। ডান দিকের খেতটায় সাদা আলু, বাঁ দিকেরটায় লাল। যেন খেত ভরে কেউ ফুল ছড়াচ্ছে। সে শুনেছে কাউকে ডাকতে, লোকটার নাম বিপিন। সন্ধ্যায় নাকি দোতারা বাজায়, ভাওয়াইয়া গান গায়। মাটিতে ঢুকছে তার হাতে ধরা ফলা, আর বসন্ত-যন্ত্রণায় ফুলমণির মনে হচ্ছে, যেন বিদ্ধ হচ্ছে। তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যেন লাঙল চালাচ্ছে কেউ!

অসম্ভব সব ভাবনা পুরনো আম গাছটির নিচে ফেলে রেখে ফুলমণি উঠে দাঁড়ায়। এবার আলু কুড়াতে হবে। মাঠের একপাশে ডাঁই করতে হবে। বস্তায় ভরতে হবে। বয়স্ক মালিক তাড়া দিচ্ছেন। বেচারা গেল বছর আলুচাষে মার খেয়ে এবার বড় টেনশনে আছেন। আলুচাষ নয় তো, যেন জুয়া খেলা। হয় লাগবে, নয় ডুবতে হবে। গত বছরের ব্যাঙ্ক লোন শোধ হয়নি। সাবসিডিতেও কিছু উপায় হয়নি। এবার যদি দাম না পান, তবে লোকটার স্ট্রোক হবে নির্ঘাত। ফুলমণির দিকে সেভাবে তাকানইনি সে পুরুষ। তিনি তাকিয়ে আছেন আলুর দিকে। গোল গোল নধর আলু এবার, ধসা থেকে আটকেছেন। এখনও বাজার বেশ চড়া। এ বছর লোকটি ব্যাঙ্ক লোন শুধবেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন, বাড়িটার ছাদ পেটাবেন, ছেলেকে মোটরবাইক কিনে দেবেন।

ফুলমণি আলু কুড়ায়। বেশ লাগে তার। বেশ খেলা খেলা! রাজমিস্ত্রি কাজের শহুরে ঠিকাদার তাদের অসহায়তাকে চিনেছিল ঠিক। টাকা দিত, কাজ করিয়ে নিত, আবার কাজের বাইরেও কিছু নিয়ে নিত। আর ফুলমণির মনে হত, কবে যে বাগান খুলবে। সিমেন্ট-স্নান হয়ে কাজ শেষে নিজেকে পরিষ্কার করত। ব্যাগ থেকে ধোয়া চুড়িদার বার করে পরত। স্নো পাউডার মাখত। কিন্তু শহর থেকে ফেরবার অন্ধকারগুলো তাকে দগ্ধ করত। ক্যানাটার গাড়িতে গাদাগাদি ভিড়ে চেপটে যেত তার শরীর। শরীরে কিলবিল করত আঙুল। রাতে ঘরে ফিরে আবার স্নান করেও যেন গা থেকে সেসব যেতে চাইত না। মনে হত, বাগান কেন খোলে না?

আলু তুলছে ফুলমণি। ঝুঁকে ঝুঁকে সে ছবি আঁকে তার বুক দিয়ে। তাকিয়ে থাকে অসংখ্য চোখ। কিন্তু ফুলমণির বুকটা হু হু করে। এ আঙুল এক কুঁড়ি, দুই পাতা তুলত। তখন কত নরম নরম ছিল। এখন নখগুলো ধুলোবালিতে খসখসে। রাজমিস্ত্রি-কাজ তাকে কত রুক্ষ করে দিয়েছে। মরশুমি আলু-তোলা তাকে মুক্তি দেয়। দিন শেষে ব্যাগ ভরে আলু নিয়ে বাড়ি ফেরে সে। চোখ চলে যায় মাদার ফুলের গাছের দিকে। রক্তপাপড়ি। ভাঁট ফুলের বাড়বাড়ন্ত, কেমন কামগন্ধ ওঠে। তাকে মনে পড়ল ফুলমণির। সে যাকে চেয়েছিল, বড্ড রগচটা, বদমাশ একটা। তবে করম পুজোর আসরে সাদরি গানের দলে মাদল বাজাত, নাচত, ফুলমণির শরীরেও ঘোর লাগত। শেষের দিকে অফিসবাবুদের সঙ্গে বেধড়ক হল্লা মাচাল, ম্যানেজারের বাংলো ভাঙচুর করল। নেতা বনতে গিয়ে নিজেই ভ্যানিশ! কাকে কাকে জুটিয়ে ধূপগুড়ি স্টেশন থেকে একদিন চেপে পড়েছিল দক্ষিণের ট্রেনে। কেরালায় এখন লেবারি করে। সে কি কখনও ফুলমণির কথা ভাবে? কে জানে!

আলু তুলছে ফুলমণি। ঝুঁকে ঝুঁকে সে ছবি আঁকে তার বুক দিয়ে। তাকিয়ে থাকে অসংখ্য চোখ। কিন্তু ফুলমণির বুকটা হু হু করে। এ আঙুল এক কুঁড়ি, দুই পাতা তুলত। তখন কত নরম নরম ছিল। এখন নখগুলো ধুলোবালিতে খসখসে। রাজমিস্ত্রি-কাজ তাকে কত রুক্ষ করে দিয়েছে। মরশুমি আলু-তোলা তাকে মুক্তি দেয়।

বাগান থেকে ভাড়া গাড়ি আসে। অনেকে মিলে আসে-যায় সেই ছোট গাড়িতে। কত কথা, কত গল্প। রাজবংশী গ্রামে মুসলিম গ্রামে আদিবাসী পায়ের ছাপ। সাদরি কথার ফুলকি ঝরে। রাতে ফিরে আলু ভর্তা, আলুর ঝোল আর ভাত। ফুলমণি অপেক্ষা করে— একদিন বাগান খুলবেই।

পথিক বর

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

২২

বাঘের ছবিওয়ালা জাপানি দেশলাইয়ের বাক্সটার গায়ে লেপে দেওয়া বারুদে বেশ কিছু ঘষার দাগ থাকলেও ভিতরে কাঠি ভরতি। গগনেন্দ্র তা দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তারিণী বসুনিয়ার দিকে চাইতে তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'এখানে না। বাইরে কোথাও দেখো। কাঠিগুলোর নিচে একটা চিরকুট পাবে। উপর থেকে দেখে কিছু বুঝতে পারবে না।'

তারপর একটু অন্যমনস্ক সুরে বললেন, 'এবার তোমরা এসো। আমি কাল কাকভোরে বেরিয়ে যাব।'

দু'জন আর কিছু না বলে বেরিয়ে এসেছিল ঘরটা থেকে। ফেরার সময় নরেন্দ্র লণ্ঠন নিয়ে রেল লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ওদের। চারদিক তখন বেশ নিঝুম হয়ে আছে। নরেন্দ্রকে বিদায় জানিয়ে দু'জন দ্রুত হাঁটতে লাগল কদমতলার দিকে। পাটহাটির মাঠে এখন ফি-সন্ধ্যায় কোনও না কোনও গানের আসর বসছে। সেখানে আলো আর পড়বার অবকাশ পাওয়া যাবে। দু'জন তাই বেশ জোরে হাঁটতে শুরু করেছিল। মিনিটকয়েক একদমে হনহন করে হাঁটার পর মৌলিক বাড়ির দিকে চলে যাওয়া রাস্তার মুখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গগনেন্দ্র একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এখানেই তো উপেনের বার্তাটা দেখে নিতে পারি, তাই না?'

'এই অন্ধকারে?' হিদারু একটু বিস্মিত হল।

'দেশলাইটা তো আছে। তুমি হাত দুটো অঞ্জলির মতো করে পাতো তো।'

হিদারু বুঝতে পেরে দুই করতল জোড়া করে পেতে দেয়। উপেন দেশলাই থেকে সাবধানে একটা কাঠি বার করে জ্বালায়। তারপর সেই আলোয় বাকি কাঠিগুলো উপুড় করে ঢেলে দেয় হিদারুর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে। প্রথম কাঠিটা নিবে আসার আগেই একটা কাঠি তা থেকে জ্বালিয়ে ফেলে সে। ছোট্ট চৌকো মাপের ভাঁজ করা কাগজটা কাঠিগুলির উপরেই বিদ্যমান। গগনেন্দ্র সেটা তুলে নেয়।

এর পর আরও গোটা দশেক কাঠি জ্বালিয়ে চিরকুটটা কয়েকবার পড়ে ফেলে দু'জন। একটাই বাক্য। 'রাসপূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় আলিপুরদুয়ারে এসো।' হাতের লেখা যে উপেনের, সে বিষয়ে দু'জন নিঃসংশয়।

'রাসের পরে পূর্ণিমা মানে এখনও এক মাসের বেশি সময় আছে।' চিরকুটটা পকেটে রেখে গগনেন্দ্র ফিসফিস করে বলে, 'যাবে তো?'

'যাব।'

'খুব ভাল করে প্ল্যান করতে হবে। আলিপুরদুয়ার ট্রেনে যেতে হবে। ভোরবেলায় বেরিয়ে আগে যেতে হবে দোমোহানি। আমি কখনও যাইনি। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে।'

গগনেন্দ্র ফিসফিস করেই বলে যেতে লাগল। এখন দু'জন খুবই ধীরগতিতে হাঁটছিল। আলিপুরদুয়ারে তারা কোথায় যাবে, উপেনকে কীভাবে খুঁজে পাবে— এইসব প্রশ্নের উত্তরগুলো তাদের কাছে সেই মুহূর্তে মোটেও কোনও গুরুত্ব পাচ্ছিল না। জলপাইগুড়িতে গগনেন্দ্র ইদানীং নিয়মিত আসছে দিদির বাড়িতে যাওয়ার অজুহাত দিয়ে। বাবা সেটা কোনও সন্দেহ না করেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাবাকে কী বলবে, সেটাও ভাবছিল না গগনেন্দ্র। সে তখন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল, কোনও এক গুহায় সে, হিদারু আর উপেন বসে রোমহর্ষক একটা প্ল্যান তৈরি করছে। আলিপুরদুয়ার সম্পর্কে একটাই ধারণা গগনেন্দ্রর মনে ছিল। সেটা হল, সেখান থেকে পাহাড় খুব কাছে। গুহার ব্যাপারটা সেই কারণেই ভাবনায় এসে যাচ্ছিল তাঁর। সেই ভাবনার বশবর্তী হয়ে সে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিল একটানা। অবশেষে কদমতলার কাছে এসে হিদারু তার প্রসঙ্গ বদলে দিল একটা কথায়। ডান দিকে একটা বাড়ির বারান্দায় লম্ফ জ্বালিয়ে কয়েকজন শতরঞ্চি বিছিয়ে গল্প করছিল। সে বাড়ির পুব দিকে পাতলা অন্ধকারে ডুবে থাকা একটা ফাঁকা জায়গার দিকে হাত উঁচিয়ে হিদারু বলল, 'এখানেই বাড়ি বানাচ্ছি বুঝলে? এই বৈশাখেই চলে আসব। ভাল হবে, না?'

গগনেন্দ্র খেই হারিয়ে থেমে গেল। তারপর বোকার মতো একটু হেসে বলল, 'জায়গাটা তো বেশ ভাল। তোমাদের টাউন তো এদিকটায় হু হু করে বাড়ছে। দিদি বলছিল, এদিকেই একটা জমি কিনে রাখবে।'

'বাইরের ঘরটা বেশ বড় করে বানাব বুঝলে? সেখানে গান্ধির একটা ছবি থাকবে।'

হিদারু গভীর স্বরে জানায় তার ইচ্ছের কথা। গগনেন্দ্র কোনও উত্তর

দেয় না। কদমতলা আর তার লাগোয়া পাটহাটি পর্যন্ত রাস্তায় দোকানপাট তখনও বন্ধ হয়নি। হিসেবমতো এখান থেকেই দু'জনের দু'দিকে চলে যাওয়ার কথা। হিদারু অবশ্য বাড়িতে যাবে না। পাড়াতে পালাটিয়ার আসর বসেছে। সেটা দেখে ফিরবে শেষ রাতে। চৌরাস্তার কোনায় দণ্ডায়মান কদম গাছটার কাছে এসে সে গগনেন্দ্রকে বলল, 'বাড়িতে দিদি চিন্তা করবে না তো? একটু রাত হয়েছে কিন্তু।'

'দিদি জানে।'

'কী জানে?'

হিদারু প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে জানতে চাইল। গগনেন্দ্র তখনই কোনও উত্তর দিল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আচমকা হিদারুর হাত ধরে সামান্য উত্তেজিত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোনও দিন লভে পড়েছ?'

'লভ?'

'আরে, 'ফল ইন লভ' কথাটা শোনোনি?'

হিদারু হেসে ফেলল। বলল, 'শুনেছি। সে তো সাহেবদের ব্যাপার। অবশ্য নাটক-নভেলে লভে পড়ার গল্প থাকে।'

'মোটেই সাহেবদের ব্যাপার না।' বেশ উত্তেজিত দেখায় গগনেন্দ্রকে, 'লভে যে কেউ পড়তে পারে। তুমিও পড়তে পারো।'

তারপর খানিকটা লজ্জা মিশ্রিত স্বরে সে বলে, 'আমি লভে পড়েছি।'

হিদারুর সব গোলমাল হয়ে যায়। গ্রামের দিকে তাদের সমাজে অন্যের বউ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সদর আদালতে এ নিয়ে মামলাও হয় বিস্তর। গগনেন্দ্রও কি পরের বউ নিয়ে ভেগে যাবে? ব্যাপারটা কিছুতেই মেলে না তার ভাবমূর্তির সঙ্গে।

'দিদি জানে। তুমিও জানলে। কিন্তু তোমাকে এখনই আমি তার নামটা বলছি না।'

'কার নাম?'

গগনেন্দ্র জবাব দিল না। রহস্যময় হাসি উপহার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল তাঁর গন্তব্যে। হিদারু প্রেমের কাহিনি তেমন পড়েনি। মানব-মানবী প্রেম নিয়ে তার অভিজ্ঞতা শূন্য। সে কেবল এইটুকু বুঝল যে, গগনেন্দ্র যে নামটি বলতে চাইল না, তা একটি নারীর নাম। সে নারী কি পরস্ত্রী?

এটা ভেবে হিদারুর বেশ অস্বস্তি হল। গগনেন্দ্র কেন অন্যের বউকে নিয়ে মেতে উঠবে? সে কি তবে বিয়ের আগে কাউকে ভালবাসছে? সে মেয়েটা কে?

অদূরেই তেলেভাজার দোকানের পাশে বেঞ্চি পেতে জোর আলোচনায় মেতেছিল কয়েকটি যুবক। এখন তাদের মধ্যে জোর তর্ক বেধে গিয়েছে। উত্তর দিকের রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া আর গোরুর গাড়ি। গাড়োয়ান আর সহিস মিলে রাস্তার কোনায় বসে কলকেতে তামাক জ্বালিয়ে টানছে। মাঝে মাঝে দু'-একটা সাইকেল আসছিল-যাচ্ছিল। চৌমাথার সামনে এসে আরোহীরা ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল বারবার। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ফুলবাবুরা হাঁটছিলেন হেলতেদুলতে। কথাবার্তা, হইহুল্লোড়, গোরুর গলার ঘণ্টা, সাইকেলের বেল— এসব শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল অদূরে কোথাও জেনারেটর চলার ধকধক আওয়াজ। টাউনে এখনও বিজলি বাতি আসেনি।

হিদারু সেই আলো-আঁধার মাখা কদমতলার মোড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, অমরেন্দ্র সেই তেলেভাজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে যুবকদের তর্ক-বিতর্ক শুনছে। তাকে সবাই 'নাড়ু' বলে জানে। সে থিয়েটার রোডের মথুরাবাবুর ছেলে। বয়সে হিদারুর চাইতে খানিকটা ছোট। বড়লোক বাপের ছেলে। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তার উৎসাহ আছে।

তর্করত যুবকদের একজন বেশ জোর গলায় বলছিল, 'চারুবাবু, খগেনবাবু সব জেলে। কই, মুভমেন্ট তো থেমে যায়নি টাউনে! জ্যোতিষ সান্যাল তো ত্রিস্রোতায় সাহেবদের উদ্ধার করে দিচ্ছেন!'

অমরেন্দ্র মাথা নাড়িয়ে নীরবে যুবকটির কথা সমর্থন করল। এর পরেই তার চোখ গেল কদম গাছের তলায়। ধীরপায়ে হিদারুর কাছে এসে অমরেন্দ্র লঘু সুরে বলল, 'তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে ওদের ডিবেট শুনছিলে হিদারুদা?'

হিদারু হাসল। 'ছেলেছোকরাদের মধ্যে এসব নিয়ে আলোচনা হওয়া তো ভাল।' বলল সে।

'আমিও ভাবছি নেমে যাব, বুঝলে? অবশ্যি বাবা চাইছেন আমি সার্ভেয়ারের পরীক্ষায় বসি। চলো, হাঁটি। বাড়ি যাবে তো?'

হিদারু হঠাৎ বলে ফেলল, 'কীভাবে আলিপুরদুয়ার গেলে সুবিধা হয়, সেটা তুমি জানো নাড়ু?'

'আলিপুরদুয়ার?' অমরেন্দ্র দু'পাশে মাথা ঝাঁকায়। 'আমি কখনও যাইনি। তবে সেখানেও কংগ্রেসের ভাল মুভমেন্ট হচ্ছে জানি। বক্সার বন্দি শিবিরের কথাও শুনেছি। সে নাকি খুব দুর্গম জায়গা। পালিয়ে যাওয়ার কোনও চান্সই নেই।'

তারপর একটু ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলল, 'টাউনে সব ব্যাপারে এখন পুলিশের কড়া নজর, বুঝলে? কিছু করতে চাইলে খুব গোপনে করবে। ওই দেখো!'

গাড়োয়ান-সহিসের দল যেখানে বসে তামাক সেবন করছিল, তার ঠিক দশ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো হাবিলদারকে ইশারায় দেখিয়ে দিল অমরেন্দ্র। হিদারুর মনে হল, পুলিশ দুটো তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'চলো, হাঁটি।'

অমরেন্দ্র আর হিদারু পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মিষ্টি একটা গন্ধ আসছিল হিদারুর নাকে। অমরেন্দ্র নির্ঘাত ভাল কোনও আতর মেখেছে। বাতাসে কার্তিকের হিম। থানার সামনে এসে বাঁ দিকে ক্লাইভ স্ট্রিটের পথটা ধরল অমরেন্দ্র। হিদারু যাবে ডান দিকে। কিন্তু অমরেন্দ্র যেতে গিয়েও আবার ফিরে লে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি হিদারুদা।'

'কী?'

'খুদিদার এক রিলেটিভ এসে থাকত না কলকাতা থেকে? আমার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল। ওর নাম উপেন। তোমার সঙ্গেও তো বেশ আলাপ ছিল, না?'

'হ্যাঁ।' হিদারুর গলাটা সামান্য কেঁপে গেল যেন। অমরেন্দ্র কি কিছু জানে?

'সে এখন কোথায়?'

'জানি না। শুনেছি ব্যবসায় নেমেছে।'

'ছেলেটাকে বেশ ভাল লেগেছিল। জলপাইগুড়িতে যদি আবার আসে, তবে আমায় খবর দিয়ো তো। মনে হয় না উপেন ব্যবসা করছে। ওর মধ্যে আগুন ছিল। গুড নাইট!'

আর দাঁড়াল না অমরেন্দ্র। ক্লাইভ স্ট্রিটের পথ ধরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কাছেই থানার গেটে দাঁড়ানো একটা কনস্টেবল জরিপ করছিল ওদের। হিদারু আর দাঁড়াল না। একরাশ প্রশ্ন মনের মধ্যে জমা করে থানার পাশের রাস্তা দিয়ে পা চালাল করলা নদী পার হওয়ার জন্য। দিনটা বড় উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ হচ্ছে আজ। তারিণী বসুনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ, উপেনের চিরকুট, আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার ভাবনার সঙ্গে অমরেন্দ্রর শেষ কথাগুলো মিলেমিশে রোমাঞ্চকর একটা সময় কাটল সন্ধের পর থেকে।

কিন্তু একা একা খানিকক্ষণ হাঁটার পর হিদারু বুঝল যে, যাবতীয় উত্তেজনা টপকে তার মাথায় একটা কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কথাটার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার কোনও সম্পর্ক নেই। কথাটা বড়ই ব্যক্তিগত।

গগনেন্দ্র 'লভ'-এ পড়েছে!

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

নারী অবমাননা ধ্বংসেরই ইঙ্গিত দেয়

পৃথিবীর সর্বকালের এবং সর্বভাষার তিনটি পুরাণ বা মহাকাব্য কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে রামায়ণ, মহাভারত আর ইলিয়াড-এর উল্লেখ অবাক করে না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, বাল্মীকি, ব্যাসদেব এবং হোমার প্রণীত তিনটি মহাকাব্যই যুদ্ধকেন্দ্রিক। আরও আশ্চর্যের, এই তিনটি যুদ্ধের কারণই ছিল নারী অপহরণ অথবা অবমাননা। ইলিয়াড-এ হোমার দেখিয়েছেন ট্রয়ের ধ্বংসের কারণ নারী অপহরণ। বাল্মীকির মূল আখ্যান জুড়ে লঙ্কা ধ্বংস কিংবা রাবণের বংশ নিধন, তার কারণও সীতা অপহরণ। আর মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গোটা কৌরবকুল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার কারণও দ্রৌপদীকে অবমাননা। যে দ্রৌপদী শাশুড়ি মাতার কথামতো পাঁচ স্বামীকে বরণ করেছিলেন, তাঁরাই আবার নিজেদের স্ত্রীকে পাশা খেলায় বাজি রেখে হেরে ভূত হয়েছিলেন। তার জন্য পদে পদে মূল্য দিতে হয়েছিল তো দ্রৌপদীকেই। পূর্ণযৌবনা থেকে শুরু করে যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ, তখনও জয়দ্রথ তাঁকে অপহরণ করতে ভুলে যান যে, তিনি দ্রৌপদীর নন্দাই। রেহাই মেলে না যাটেও। তখনও কীচক তাঁর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। পুরাণের সঙ্গে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার এত আশ্চর্য মিল হয় কী করে? কোনও কার্যকারণ মেলে না। এই মিল কি অন্য কোনও কথা কিংবা ইঙ্গিত?

কলকাতা দিল্লি আফ্রিকা পৃথিবীর সব কোণেই নন্দিতার স্মৃতিতে জেগে থাকে ডুয়ার্স

পরিচয় স্বনামধন্যা কথা সাহিত্যিক ও বিশ্ব পর্যটক। জলপাইগুড়ি শহরের শিল্প সমিতি পাড়ায় জন্ম হলেও নন্দিতা বাগচির শৈশব-কৈশোর কেটেছে বীরপাড়ার তাসাটি চা-বাগানে। সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। তখন নন্দিতা মৈত্রর বাবা বিভূতিভূষণ ছিলেন তাসাটি চা-বাগানের ডাক্তার। বিরাট বড় বাংলো, সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে সবজি আর ফুলের বাগান। সেখানে সারাদিন ধরে কাজ করত মালি। শুধু কি তা-ই? ছিল কাজের লোক, ধোপা, এমনকি চৌকিদারও। সাবসিডাইজড রেটে পাওয়া যেত জ্বালানি, রেশন, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে আরও বহু সুযোগ-সুবিধা। ইউরোপিয়ান মালিকানার এই বাগানে কুলিদের এত আন্দোলন করতে দেখিনি তখন, জানালেন নন্দিতা। বললেন, 'কুলি লাইনে তেমন কোনও অসন্তোষও ছিল না। বাবা যেহেতু ডাক্তার ছিলেন, তাই রাতবিরেতে অনেক সময়ই কুলিরা চলে আসত বাড়িতে। আমি বহুবার বাবার সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। সেসব দিন সারাজীবনেও ভোলবার নয়। এখন চা-বাগানের দুঃখের খবরগুলি শুনে বড্ড মন খারাপ করে।'

বীরপাড়া স্কুলে পড়বার সময় থেকেই শিক্ষক অর্ণব সেনের খুব প্রিয় ছাত্রী ছিলেন নন্দিতা। বিজ্ঞানে খুব ভাল হওয়া সত্ত্বেও নন্দিতা বাংলায় বরাবর সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন।

তা-ই দেখে তিনি বারবার বলতেন, 'তুমি বাংলা নিয়ে পড়ো।' কিন্তু বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করবার মধ্যে তেমন একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পেতেন না নন্দিতা। বাড়িতে সাহিত্যের আবহাওয়া থাকায় বাংলা সাহিত্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। বাবা ডাক্তার হলেও তিনি লেখালেখি করতেন, বাড়িতে সাহিত্যপাঠের আসর বসাতেন। মা এসবের মধ্যে না থাকলেও প্রতিদিন সব কাজকর্ম সেরে উঠে মনোযোগ দিয়ে অন্তত একটা করে চিঠি লিখতেন। তখন ছোট্ট নন্দিতা এর মর্ম না বুঝলেও পরে বুঝেছেন, এসব চিঠিই ছিল মায়ের সাহিত্যচর্চা।

বীরপাড়া স্কুল পেরিয়ে আলিপুরদুয়ার কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা। এখানে তিনি বেণু দত্ত রায়ের দৃষ্টিগোচর এবং আশীর্বাদধন্যা হন। এর পর নন্দিতা মৈত্র কোচবিহারের ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নন্দিতা বাগচি হিসেবে প্রথমে চলে যান কলকাতা, তারপর দিল্লি, অবশেষে আফ্রিকার নাইজেরিয়ায়। জায়গাটা ছিল উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়া আর ক্যামেরুনের সীমানায় 'মুবি'। সেখানে পনেরো বছর থাকাকালীন সঞ্চয় হয় বহু অভিজ্ঞতা। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে সেসব অভিজ্ঞতার কথা-কাহিনি দু'মলাটে বাঁধা পড়ে পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে। মুবিতে থাকার সময় সেখানকার একটি 'ও লেভেল' স্কুলে (ক্লাস টেন পর্যন্ত) তিনি অঙ্কের শিক্ষিকা ছিলেন। সেটা গত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। ওই বছরগুলিতে বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রায় কোনও সম্পর্কই ছিল না। শুধু দম্পতিযুগল কথা বলতেন বাংলায়। ভারতীয়ও যাঁরা ছিলেন,

এর পর ৪৩ পাতায়

রাখী'স বুটিক ফ্যাশনের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

পাঁচ বন্ধু মিলে তৈরি হল 'রঙ্গোলি'। সেই রঙ্গোলিরই নতুন ফর্ম হল 'রাখীস বুটিক'। তখন আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি মাত্র। ছোটবেলা থেকেই হাতের কাজ, বিশেষ

করে সেলাই-ফোঁড়াই-এর উপর আগ্রহ ছিল। যার থেকে আমারই উদ্যোগে বুটিক খোলার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সেটা ছিল নয়ের দশকের প্রথম দিক। সেটা যে খারাপ চলছিল, তা নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রায় সবাই সংসারী হয়ে যাওয়ায় আর তেমনভাবে বুটিক চালানো যাচ্ছিল না। কিন্তু আমার মধ্যে ইচ্ছেটা ভীষণভাবেই ছিল। আমিও বিয়ের পর কলকাতা এবং হায়দরাবাদ চলে যাই। সে সব জায়গাতেও আমি কিন্তু কাজ চালিয়েই গিয়েছি। শেষমেশ আবার শিলিগুড়িতে ফিরে আসি। ফিরে আসার পর নতুন উদ্যোগে মনপ্রাণ দিয়ে শুরু করি আমার এই নতুন বুটিক। নাম দিই 'রাখী'স বুটিক' (Rakhee's Boutique)। পনেরো বছর ধরে একই রকমভাবে চলছে কোনও বাধাবিঘ্ন ছাড়াই।

বহু মহিলা এখানে আসছেন, পছন্দসই জিনিস কিনছেন এবং সন্তুষ্ট হচ্ছেন। এটা আমার খুব বড় পাওয়া। আমার বুটিকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল কাঁথা স্টিচ, এমব্রডয়ারি ও প্রিন্টের কাজ, যেগুলো একেবারেই আমাদের নিজস্ব। নানান ডিজাইনে কাঁথা স্টিচ, এমব্রডয়ারি ও প্রিন্টের কাজ এখানে হয় শাড়ি, কুর্তি, সালোয়ার-কামিজ, ব্লাউজ পিস, দোপাট্টা ইত্যাদি নানান আইটেমের ওপর। আমার বুটিকের সব আইটেমই মেয়েদের জন্য। তবে পুরুষদের জন্যও বিভিন্ন ড্রেস মেটিরিয়াল পাওয়া যায়। তাছাড়াও আছে পাঞ্জাবির রকমারি সম্ভার। আমার বুটিকের আর একটি বিশেষ দিক হল, এখানে সব সময় খাঁটি জিনিস পাবেন। কটন বা সিল্ক যাই হোক না কেন। এটাই আমাদের ব্যবসার মূলধন।

Rakhee's

a fashion design house .....

সিল্ক, তসর, প্রিন্ট, এমব্রডয়ারি, তাঁত,
মিক্স এন্ড ম্যাচ, লেডিজ কুর্তি, স্কার্ট, প্লাজো, পাঞ্জাবী,
রেডিমেড ব্লাউজ ও বিভিন্ন রাজ্যের প্রাদেশিক শাড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
Rakhee's বুটিক।

টেইলারিং এর ব্যবস্থা আছে

SILIGURI : 15, Sisir Bhaduri Sarani, Mitra Sammilani Lane, Bidhan Road (Opp. Stadium), Siliguri - 734 001
Ph. : 0353-2524203 (S), Mob. : 98324-60174, 98324-92502
e-mail : rakhee192@gmail.com / web. : www.rakheesboutic.co.in

KOLKATA : AB-21, Salt Lake City, Sec.-1, Near P.N.B. Island, Kolkata - 700 064
Mob. : 09433190250 / 09832868496
e-mail : kdkshamadeb@gmail.com

Follow us :

টেক টক

অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর অসুবিধে

বিভিন্ন সময়ে হঠাৎ করে ট্রেনে বা প্লেনে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আপনার হয়েই থাকে। লাইনে না দাঁড়িয়ে বাড়িতে বসেই আপনি টিকিটের অবস্থান যেমন দেখে নিতে পারেন, তেমনি বাড়িতে বসেই আপনি টিকিট কেটেও নিতে পারেন। প্রয়োজন শুধু ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর। যে কোনও অনলাইন শপিং-এও প্রয়োজন এই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং। তাই যাঁরা ইতিমধ্যেই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করছেন এবং যাঁরা করতে চাইছেন, তাঁদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এবং সুবিধা-অসুবিধাগুলি জেনে রাখা দরকার। গত সংখ্যায় সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল, এই সংখ্যায় অসুবিধাগুলি দেওয়া হল।

❑ অসুবিধা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই বলতে হয়, যেহেতু এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ ওয়েব বেসড আর ইলেকট্রনিক সিস্টেম, তাই এর ক্রিয়াপ্রণালী হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু আমরা সবাই জানি ইন্টারনেট কানেকশনের দুরবস্থার কথা। আমাদের দেশের মেট্রোপলিটান সিটিগুলো ছাড়া প্রায় সব জায়গাতেই ইন্টারনেট কানেকশন স্পিডের খুবই খারাপ অবস্থা। একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কিং-এর কাজ চলাকালীন যদি ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, তবে তার পরিমাণ ভয়ংকর হতে পারে। আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না যে কাজটি সম্পূর্ণ হল কি না। যেহেতু ব্যাপারটা অর্থনৈতিক, তাই কোনও প্রকার অনিশ্চয়তা খুবই বিপজ্জনক।

❑ হ্যাঁ, এটি সাধারণত নিরাপদ, কিন্তু গোটা বিশ্বে হাজার হাজার 'সাইবার থিফ' সারা দিনরাত্রি বসে আছে তথ্য চুরি করার জন্য। আপনার ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড, ব্যাঙ্ক ডিটেইল, পিন নাম্বার, ক্লায়েন্ট ডিটেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা ও বজায় রাখার জন্য প্রতি মুহূর্তে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। বলা যেতে পারে, উদাসীন বা অসাবধান ব্যক্তিদের জন্য অনলাইন ব্যাঙ্কিং নয়।

❑ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অনলাইন পরিষেবা একেকরকম হয়। অনলাইন ব্যাঙ্কিং ব্যবহারের ধরনের প্রকারভেদ থাকে। যাঁদের অনলাইন/ইন্টারনেটের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা কম, তাঁদের এটি ব্যবহারে সমস্যা হতেই পারে।

❑ যদিও প্রায় সব ব্যাঙ্কেরই ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর ডেডিকেটেড কাস্টমার সার্ভিস টিম থাকে, তবুও সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ না থাকায় বিশেষ বিশেষ সময়ে গ্রাহকদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

❑ ব্যাঙ্কের সার্ভার ডাউন বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ইন্টারনেট বসে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করা যায় না।

❑ অনলাইন ফান্ড ট্রান্সফারের মতো কাজের সময় অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে সেটা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন হয়। একাধিক দিন ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে যোগাযোগ করে অনেক সময় নষ্ট করে ভুল কাজটি সঠিক করতে হয়।

প্রত্যেকটি ট্রানজাকশনের একটি সময়সীমা থাকে, সেই সময়সীমার মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত এই সময়সীমা কোথাও উল্লেখ করা থাকে না। কাজ শেষ হওয়ার আগে 'টাইমড আউট' হয়ে গেলে বোঝা কঠিন হয় যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কি না।

❑ যেহেতু অনলাইন ব্যাঙ্কিং একটি ভার্চুয়াল ব্যাঙ্কিং সিস্টেম, সুতরাং এখানে কোনও নগদ অর্থ রাশির ব্যাপার থাকে না। অনেক সময়ই বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজে নগদ অর্থ রাশির প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেদিক থেকে এর ব্যবহার মূল্যহীন।

আমরা দেখে নিলাম অনলাইন ব্যাঙ্কিং-এর কী কী ভাল ও খারাপ দিক আছে। এবার এমন কিছু পরামর্শ দেওয়া যাক, যাতে নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবহার সম্ভব হয়।

ক) ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহারের সময় ডিসকানেকশন এড়ানোর জন্য হাই স্পিড স্ট্রং ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।

খ) কোনও পাবলিক প্লেস কম্পিউটার, যেমন সাইবার ক্যাফে/অফিস কম্পিউটার ইত্যাদি (সবাই ব্যবহার করে এমন) ব্যবহার করা যাবে না।

গ) যে ব্রাউজারটি ব্যবহার করা হবে, তার সিকিয়োরিটি স্টেটাস জানতে হবে, সিকিয়োর ব্রাউজার ব্যবহার করতে হবে। যেমন— Google Chrome with incognito mode or EPIC browser, etc.

ঘ) নিজের ইউজার নেম/পাসওয়ার্ড মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করে ফেলতে হবে, যাতে কেউ ফলো করলেও ধরতে না পারে।

ঙ) পারলে সব ট্রানজাকশনের রসিদ নিয়ে রাখতে হবে।

চ) অনলাইন ট্রানজাকশন, পাসওয়ার্ড, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেই ব্রাউজারের হিস্ট্রি/কুকিজ ইত্যাদি ক্লিয়ার করে দিতে হবে।

প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তেই টেকনোলজি পালটে যাচ্ছে। আরও আধুনিক প্রযুক্তি চলে আসবে। হয়ত আলোচনায় উঠে এসেছে অনেক বাধ্যবাধকতা। কিছু ভীতি আছে। তবুও আমাদের জানতে হবে ও মানতেও হবে, প্রযুক্তিই ভবিষ্যৎ। তাই অনলাইন ব্যাঙ্কিংই ব্যাঙ্কিং-এর ভবিষ্যৎ।

জয়ন্ত ভৌমিক

মেঘপিয়োন

প্রেমের স্মৃতি রয়ে যায় অন্তরে চিরদিন

আমার সঙ্গে একটি ছেলের সম্পর্ক প্রায় পাঁচ বছর গড়িয়েছিল। আমি গভীরভাবে ওর সঙ্গে জড়িয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে সবরকম সম্পর্ক হয়েছে। এর পর এক সময়ে হঠাৎই আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা শুরু হয়ে যায় বাড়ি থেকে, আর আমি ছেলেটিকে এড়িয়ে যেতে থাকি। ও তখনও উপার্জনক্ষম ছিল না বলে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, বাড়ি থেকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি করবে। ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ও বারবার বলেছে, আর দু'-এক বছর বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখতে। আমি জানতাম যে, সেটা অসম্ভব। আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি শহরের বাইরে চলে গেলাম। আর ওর সঙ্গে দেখাও হয়নি কোনও দিন। কিছুদিন আগে ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় আমাদের। আমি আবার আগের মতোই ইনভল্ভ হয়ে পড়ছি। জানি, এতে হয়ত আমার স্বামীকে ঠকানো হচ্ছে, কিন্তু ও আমার জীবনের প্রথম এবং প্রকৃত প্রেম। ফলে ওকে আমি কোনওভাবেই উপেক্ষা করতে পারছি না। অসম্ভব অস্থিরতার মধ্যে আছি। কোনও কাজে মন বসছে না।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কলকাতা দিল্লি আফ্রিকা সর্বত্রই জেগে থাকে ডুয়ার্সের স্মৃতি

৪০ পাতার পর

তাঁরা হয় উত্তরপ্রদেশের, নয় পাঞ্জাবি অথবা অন্য কোনও রাজ্যের। ফলে কথ্য ভাষা হত হিন্দি কিংবা উর্দু। পাকিস্তান থেকে অনেক মানুষ এসে এখানে থাকায় উর্দুটাও জানা হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া শিখে ফেলতে হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষা। মুবিতে থাকার সময় যুক্ত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন'স ক্লাব-এর সঙ্গে। ক্লাবটি তৈরি করেছিলেন একজন ইউরোপিয়ান মিশনারি। এই ক্লাবের কাজ ছিল গ্রামেগঞ্জে গিয়ে কম্বল বিলি করা, হাসপাতালে শিশুদের জন্য দুধের কৌটো দেওয়া, কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নানাবিধ সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া। ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নন্দিতা।

১৯৮৭ সালে দেশে ফিরে কলকাতায় একটি স্থায়ী ঠিকানা গড়লেন। কিছুটা যেন থিতু হলেন। কিন্তু নন্দিতা ভিতরে ভিতরে অস্থির বোধ করছিলেন। বিদেশের নানা কিছু দেখাশোনা আর এতদিনকার চেপে থাকা বাংলা ভাষা তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়েই লিখতে শুরু করলেন। ছোট-বড় কত পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, আবার বাতিল হওয়ার কষ্টও পেয়েছেন বহুবার। তবু হার মেনে হাল ছাড়েননি। আসলে লেখাটা তখন নেশায় পেয়ে বসেছে। একে একে বেরল বই— 'বৃষ্টির পুত্র-কন্যারা', 'ইতি তোমার মণি', 'সখা', 'সূর্যের ঘোড়াগুলি', 'সেই মোহনার ধারে', 'আলাপ', 'পরিযায়ী', 'কলম্বাসের নতুন পৃথিবী', 'ওয়ান্ডারলাস্ট', 'চিলমারীর বন্দর', আরও বেশ কয়েকটি। 'দেশ' পত্রিকায় এখন চলছে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'পুনর্বাসন'। 'বর্তমানের মহিলা ঔপন্যাসিক'— বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর গবেষণায় জায়গা নিয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলি। এদিক থেকে ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি সফল।

নন্দিতা মা হিসেবেও অত্যন্ত সফল। নিজেরা আফ্রিকায় থাকলেও পুত্র ও কন্যার জন্য বেছেছিলেন কলকাতার 'লা মার্টিনা' এবং কার্শিয়াঙের 'ডাউহিল'-এর মতো স্কুল। ওরা যাতে বাংলার কাছাকাছি থাকার সুযোগ পায় এবং একটি বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে বাংলা ওদের পাঠ্যে থাকে— সিদ্ধান্তের পিছনের মূল লক্ষ্য সেটাই। এখন তারা স্বাবলম্বী এবং যে যার কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। আর নন্দিতা বাগচির এখনকার সারাক্ষণের সঙ্গী শুধু কলম।

শ্বেতা সরখেল

ডাক্তারের ডুয়ার্স

শিশুদের দাঁতের বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার

(১ম ভাগ)

আজ আমরা শিশুদের দাঁতের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। যদিও বাচ্চাদের দুধের দাঁত এক সময় পড়ে যায়, তারপর নতুন করে ওই জায়গাতেই ওঠে। তবুও ওই দুধের দাঁত ভাল রাখতে হয়। তা না হলে শিশুর আগামী দিনের অর্থাৎ নতুন দাঁতের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে না।

আমরা রোজ শিশুদের যে ধরনের মাড়ি ও দাঁতের সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখি, তার

মধ্যে কিছু হল— ১) Dental caries (দাঁতের ক্ষয়রোগ), ২) Thumb sucking, ৩) Tongue thrusting, ৪) Lip sucking, ৫) Flourosis, ৬) Early tooth loss, ৭) Dental emergency due to sudden accident, etc.

আজকের আলোচ্য বিষয় হল, দাঁতের ক্ষয়রোগ বা Dental caries। কিছু বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমাদের খাবারের মধ্যে থাকা শর্করাকে ভেঙে অ্যাসিড তৈরি করে, যা আমাদের দাঁতের বাইরের আস্তরণ অর্থাৎ এনামেলকে ক্ষয় করে ফেলে। এটিই হল দাঁতের ক্ষয়রোগ, যাকে অজ্ঞাতবশত আমরা দাঁতের পোকা লাগা বলি। দাঁতের ক্ষয়রোগ থেকে শিশুদের যে সমস্যা হতে পারে তা হল— ১) দাঁতে ব্যথা, ২) দাঁতে পুঁজ জমা, ৩) তাড়াতাড়ি দাঁত পড়ে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া। আর যেহেতু এই দুধের দাঁত 'Space saver', তাই ওই দাঁত নষ্ট হলে নতুন দাঁত উঠবে এলোমেলো ভাবে।

ড. পায়েল আগরওয়াল চক্রবর্তী

কিশোরী দিবস উদ্‌যাপন

কিশোরীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং সম্পূর্ণ উন্নতির লক্ষ্যে এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। আমাদের মতো দেশে এখনও বেশ কিছু সামাজিক বৈষম্য রয়েছে একটি কিশোরীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে। এ দেশের এই সামাজিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে কিশোরীদের জীবনধারার উন্নতি ঘটাতে হবে। তাদের সুস্থ, জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নারী হিসেবে গড়ে তুলতেও সাহায্য কবতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সঠিক আচরণ গড়ে তুলতে সবলা কন্যাশ্রী কনভার্জেন্স প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে ১১-১৮ বছর বয়সি কিশোরী মেয়েদের জন্য। যার একটি অঙ্গ এই কিশোরী দিবস পালন।

মাল আইসিডিএস প্রজেক্ট ও বিতান-এর যৌথ উদ্যোগে এবং রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় রাঙামাটি কিশোর লাইন ফুটবল ময়দানে পালিত হয় কিশোরী দিবস। তিনজন ডাক্তার, চারজন এএনএম, দু'জন টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্য পরীক্ষক ও অন্বেষা দিদিদের নিয়ে একটি টিম মাঠের একদিকে বসে যায় কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ, আয়রন ট্যাবলেট ইত্যাদি দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এগিয়ে আসে কিশোরী কার্ড পূরণ করতে ও হেল্‌থ টিমকে সাহায্য করতে।

অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন মাল মহকুমা শাসক জ্যোতির্ময় তাঁতী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ভূষণ শেরপা, বিএমওএইচ দীপকরঞ্জন দাস, অফিসার ইন-চার্জ মাল থানা নন্দকুমার দত্ত, শিশুকল্যাণ প্রকল্প আধিকারিক রণজিৎ নট্ট, প্রধান রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত নাগেশ্বর পাসোয়ান প্রমুখ। শৈশব থেকে কৈশোর এবং তার পরবর্তী দিনগুলিতে সম্পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের গড়ে তুলতে পারলেই কিশোরী দিবস পালন সার্থক।

রীতা রায়, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (মাল), বিতান

'তক্কাতক্কি'র এ মাসের বিষয়

'বয়স্কদের স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমবাসের মধ্যে কোনও কষ্ট কিংবা লজ্জা নেই।' মতামত হতে হবে অনধিক ২০০ শব্দে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা— 'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে- **'এখন ডুয়ার্স', মুক্তাভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। অথবা ই-মেল করুন— srimati.dooars @gmail.com**

রূপসী ডুয়ার্স

কেশই সৌন্দর্যের চাবিকাঠি

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি

একমাথা সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ মানুষকে এনে দেয় আলাদা আত্মবিশ্বাস, তা সে নারী হোক আর পুরুষ। কেশকে সুন্দর আকর্ষক করতে আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

পুরাকালে মহিলারা অগুরু, চন্দন ও কস্তুরী দিয়ে ধূপ তৈরি করে তার ধোঁয়াতে চুল শুকিয়ে নানারকম কবরী বাঁধত। লম্বা চুল রাখা ছিল পুরাকালের রীতি। পুরনো বইপত্রে ও ঠাকুরবাড়ির রূপচর্চাতে দেখা যায়— রোজ বিকেলে মহিলারা তাঁদের কেশচর্চায় বসতেন। ভেষজ সুগন্ধী তেল সারা মাথায়, চুলে বিলি কেটে লাগিয়ে তারপর নানা ধরনের কবরীতে নিজেদের সুসজ্জিত করতেন এবং তাতে নানারকম সোনা ও রূপোর কাঁটা ও ফুল লাগাতেন। আমাদের চুল যেমন শ্রীবৃদ্ধি করে, আবার সূর্যকিরণ থেকে মাথাকেও বাঁচায়।

চুলের গঠনে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। এটা বংশগত ও জিনঘটিত কারণে ঘটে। চুলের বাইরের অংশ মৃত অথচ কারও চকচকে, আবার কারও স্বাস্থ্যহীন। চুলের বাইরেটা যেসব কোষ দিয়ে ঢাকা, তারা পরপর সাজানো থাকে। যদি কোষগুলো সমানভাবে সাজানো ও মসৃণ থাকে তাহলে চুলে আলোর প্রতিফলন ভাল হয়। চুল কালো ও উজ্জ্বল দেখায়। কোষগুলো এবড়োখেবড়ো থাকলে প্রতিফলন ভাল হয় না। তখন চুল ম্যাড়মেড়ে, খসখসে ও লালচে দেখায়।

ত্বকের গভীরে যেখানে বাল্‌বের কোষগুলো রয়েছে, সেখানে ক্রমশ নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে দণ্ডটি উপর দিকে ওঠে। জীবন্ত কোষগুলি উপর দিকে ওঠার সময় ক্যারোটিন সঞ্চয় করছে, শক্ত হচ্ছে এবং মৃত কোষে পরিণত হচ্ছে। এই মৃত কোষের সমষ্টি হল চুল, যা ত্বকের উপরিভাগে দেখা যায়। চুল তৈরির মূল উপাদান প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড। এই উপাদান শিরা-উপশিরার মাধ্যমে চুলের গোড়ায় পৌঁছয়। সেই কারণে চুলের গোড়ায় ও ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ঠিকমতো হওয়া দরকার।

এবার আসা যাক চুলের স্বাস্থ্যের কথায়—

বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় একটা কথা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে— চুল পড়ছে, অকালে পাকছে, রুক্ষ ও বিবর্ণ হচ্ছে। এর অনেক কারণ— প্রথমেই আমার যেটা মনে হয়— নিশ্চিন্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন আজ আর কারও নেই। সর্বদা টেনশন, ভয়, আশঙ্কা, অশান্তি। এছাড়া রয়েছে পরিবেশ দূষণ। টাটকা শাকসবজি পাই না, সব কিছুতেই রাসায়নিক সার এবং রং দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণ। বর্তমানে রূপচর্চার সম্ভার বেড়েছে, সকলের মধ্যে সুন্দর হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এর ফলে অনেক সময় না জেনে, না বুঝে অনেকেই রূপচর্চার নামে অপ্রয়োজনীয় নানা জিনিস ব্যবহার করেন। তার ফলেও চুল খারাপ হয়ে থাকে।

চুলের গোড়ায় মেলানোসাইট থাকে, তারা চুলকে কালো রাখে। নানা কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে চুল সাদা হয়ে যায়। ঠিকমতো রক্ত সঞ্চালন হলে অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ হয়, তাতে চুল অকালে পাকে না। তবে চুল পাকা অনেকটাই বংশগত। দিনে ৪০-১০০টি চুল পড়লে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু এর বেশি হলে দেখতে হবে শরীরে কোনও অসুবিধা আছে কিনা। যেমন রক্তাল্পতা, থাইরয়েড ইত্যাদি। আর একটা প্রধান সমস্যা খুশকি। খুশকি থাকলে চুল পড়ে। এর থেকে মুক্তি পেতে চুল পরিষ্কার রাখুন। আপনার চুল কেমন তা বুঝে শ্যাম্পু করুন। তৈলাক্ত চুলের আলাদা শ্যাম্পু আর শুষ্ক ও রুক্ষ চুলের আলাদা শ্যাম্পু। খুশকি থাকলে তেল দেবেন না। আমি কয়েকটা ঘরোয়া পদ্ধতি বলব, যা খুশকিতে উপকার দেবে।

১) কাঁচা আদার রস, পেঁয়াজের রস, কেশুতপাতা ও মেথি বাটা লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রাখুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পরের দিন শ্যাম্পু করুন। শুষ্ক চুল যাঁদের, তাঁরাই লাগাবেন সপ্তাহে দু'দিন। আর যাঁদের চুল তৈলাক্ত, তাঁরা টক দই, নিমপাতা ও পাতিলেবুর রস এবং ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে কোনও ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

এছাড়া চিরুনি, ব্রাশ, তোয়ালে, বালিশের ওয়াড় পরিষ্কার রাখবেন। খুশকি বাগে না এলে কোনও বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান—
sahac43@gmail.com এই ইমেল আইডি-তে।

নিম ঝোল

নিমের ভেষজ গুণ সম্বন্ধে আমরা সবাই কমবেশি অবহিত। কিন্তু তেতো স্বাদের জন্য আমাদের অনেকেরই নিমপাতায় অরুচি। বিশেষত বাড়ির খুদেরা তো নিমপাতা মুখেই তুলতে চায় না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রাঁধলে নিমের গুণাগুণও বজায় থাকবে, সবাই সাগ্রহে খাবেও।

উপকরণ: নিমপাতা ১৫-২০টি, কাঁচকলা ১টি, কাঁচা পেঁপে অর্ধেক, বিনস ৪-৫টি, আলু ১টি, গাজর ১টি, শিম ৪টে অথবা পটোল ২টো, তেল ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো এবং হলুদ ১ চিমটে।

প্রণালী: প্রথমে সবজিগুলো লম্বা করে কেটে নিন। তারপর নিমপাতাগুলোকে শুকনো খোলায় ভালভাবে নাড়াচাড়া করে তুলে রাখুন। কড়াইতে তেল দিয়ে সব কাটা সবজি ভাল করে কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে পরিমাণমতো জল দিয়ে ঢেকে দিন। এর পর শুকনো করে ভাজা নিমপাতাগুলো গুঁড়ো করে নিন। সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে, নিমপাতা গুঁড়োটা ভালভাবে মিশিয়ে পাত্রটা ঢাকা দিয়ে রাখুন। আশা করি এই পরিমাণ উপকরণে তৈরি নিম ঝোল ৪-৫ জনের প্রথম পাতের পদ হিসেবে খারাপ লাগবে না।

পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়, পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি, জলপাইগুড়ি

শখের বাগান

মাটিতে বা টবে লাগান ইউফোরবিয়া মিলি

ক্যাকটাস জাতীয় গাছ ইউফোরবিয়া মিলি। বছরের যে কোনও সময় মাটিতে বা টবে লাগানো যেতে পারে। বহুবর্ষজীবী কাঁটাযুক্ত রসালো এই গাছে প্রতিদিন জল দেবার ঝক্কি নেই। টবে লাগালে মাটি ভরতি করে দিতে হবে, কারণ জল জমলে গোড়ায় পচন ধরবে। নুড়ি, বালি, মাটি মিশ্রণ করে নিতে হবে। সার হিসেবে ভার্মি কম্পোস্ট বা পাতা-পচা সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। শীতের দু'-তিন মাস বাদ দিয়ে বছরের বাকি সময় ফুল ফোটে। লাল, সাদা, হলুদ ও গোলাপি সুন্দর ফুল ফোটে, পছন্দমতো চারা আনা যাবে নার্সারি থেকে। কুড়ি টাকার মতো দাম। গাছের শাখা থেকেও নতুন চারা তৈরি করা যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসে মূল গাছ থেকে শাখা কেটে মাটিতে বসিয়ে দিলেই হবে। অবশ্যই ছায়াযুক্ত স্থানে চারা তৈরি করতে হবে। কাঁটাওয়ালা মিলি গাছ বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখাই ভাল।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

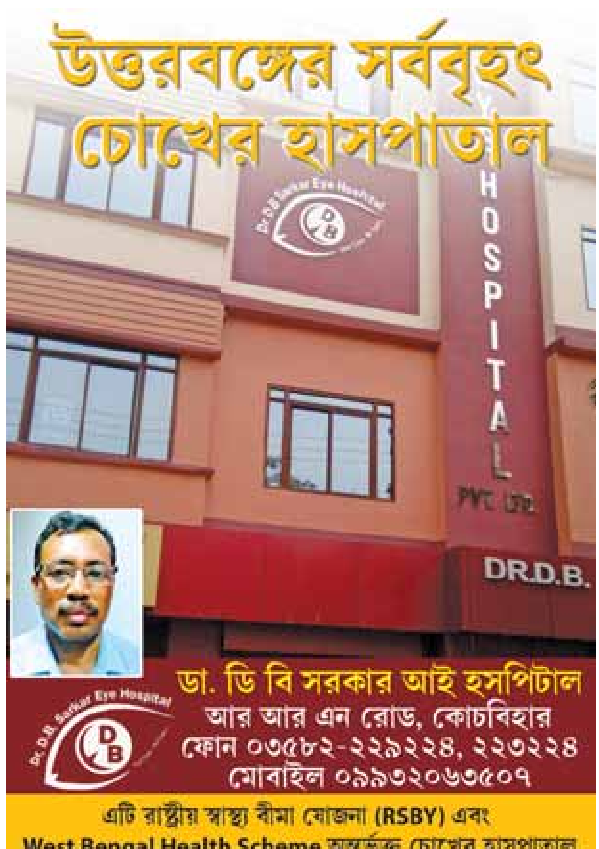

কবিতা টেনে নেয় রুকস্যাক আর লেন্সের কাছে

'কোনোদিনও কি ভেবেছিলাম আমার কবিতার বই হবে? তাও হচ্ছে। সবই ভালবাসার জন্য'— প্রথম প্রকাশিত কবিতার বইয়ের উৎসর্গপত্রে এমনটাই লিখেছেন সত্যম ভট্টাচার্য। বইয়ের প্রথম কবিতায় দগ্ধ দিনের কথা, উদ্‌বেগ, আতঙ্ক আর ত্রাসের ছায়া, হয়ত তরুণ কবির সময়ের ছায়াও। 'আলোর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন/ সদা কম্পনরত'। পরের কবিতাটিতে এক নৈসর্গিক বিভ্রান্তি, পাহাড়ের গা বেয়ে নিস্তব্ধতা নামছে নদীর উপরে, কবি বসে আছেন কালো পাথরের উপর, আর তার উপরে নেমে আসছে তারারা, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, কীসে মিশে যাবেন— পাহাড়ে, আকাশে, নাকি নিস্তব্ধতায়! জোর করে 'জর্টি' হওয়া নয়। তিনি চেষ্টা করেন ছবি বানাতে। তাঁর ইচ্ছে, স্বপ্ন ইত্যাদি পাঠক ছুঁতে পারেন। 'গলিঘুঁজির অস্পষ্ট কোলাজের পিছনে জ্বলন্ত সিগারেটের/ হাত ধরে এগিয়ে আসা টিউশন মেয়ে/ নীল নয়/ তোমার বাস্কেটে আজ দেব কিছু আধফোটা শিউলি'। কোথাও কোথাও বুনে দেন হলুদ বিষাদগাথা। কবি দেখেন 'পিচরাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য আপোস', 'গোল্লাছুটের সেই ফ্রক পরা মেয়েটা হারিয়ে ফেলেছে তার সহজপাঠের খাতা'... এমন আরও অনেক কিছু। ছোঁয়া হয়নি, তবু তাকে ছুঁয়ে থাকে সে— 'তোমার গার্নিয়ার চুলে খেলছে/ শেষবেলার রোদ্দুর/ পাটভাঙা তাঁতশাড়িতে তখন বুনোঘাস/ এল সানসিল্ক চুল'; এ সময়ের মানুষ সত্যম সনাতনী ইচ্ছে বহন করেন। উত্তরের নিসর্গ মাঝে মাঝেই উঁকি দেয় তাঁর কবিতায়; যেমন 'গভীর জঙ্গলের জ্যোৎস্নাভেজা রাতে/ ছুরিতে ঝলকাচ্ছে চাঁদ/ রেলব্রিজ থেকে রুপোলি বালুচর/ আকণ্ঠ মদ রেখেছে শরীরে/ অচেনা কনসার্টে মিশে যাচ্ছে সমস্ত আর্তি'। তিনি অনুভব করেন, কঠিন বাঁকগুলি পেরলেই পাওয়া যেতে পারে অদ্ভুত ল্যান্ডস্কেপ। তাঁর নিজের মতো করে বলতে পারেন, 'নিঃশব্দ ঝরছে পাতায় পাতায়/ বুকভরা মিসকল'।

কবিতার বইয়ের শেষ মলাটে লেখা হয়েছে, 'সীমানা অতিক্রম করে তার চোখ চলে যায় ঢাকনা সরানো সবুজ ক্যানভাসের ভিতর... তৈরি হতে থাকে অ্যালবাম।... সত্যমের সদ্যোজাত ল্যান্ডস্কেপ আমাদের টেনে নিয়ে যায় আরও একবার রুকস্যাকের কাছে। লেন্সের দিকে।' এটা সত্যি বলেই তাঁর কবিতা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

যেখানে রোদেরা নরম, সত্যম ভট্টাচার্য, এখন বাংলা কবিতার কাগজ, জলপাইগুড়ি, মূল্য ৫০ টাকা

শব্দ রুমালে জড়ানো হৃদয়ে ছোট্ট পেসমেকার

শব্দে শব্দে বোনা 'শব্দ রুমাল'। তার প্রতিটা সুতোর টান, নকশার শরীর তৈরি হয়েছে শব্দ দিয়ে। ছোট ছোট কবিতায় সাজানো সংকলনটির রচয়িতা কমল ভট্টাচার্য।

কবিতার শরীর জুড়ে বিষণ্ণতা আঁকা। যে বিষণ্ণতা যন্ত্রণাময় নয়, এক অপূর্ব ভাললাগায় জড়িয়ে রাখে পাঠকের মন। পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে বিষণ্ণ মায়াবী মুহূর্তগুলি। 'বিকেলজুড়ে/ মনখারাপের বৃষ্টি/ সন্ধ্যাতারাদের সঙ্গে/ হল না আজ/ পাড়া বেড়ানোর গান।' এই বিষণ্ণতার সুর বইটির অন্যান্য কবিতাকেও ছুঁয়ে আছে। 'অবিকল' কবিতাটিতে একটি পুরনো বিকেল কবির হৃদয় স্পর্শ করে শাশ্বত হয়ে আছে। সেই কবেকার একটি বিকেল— শেষ রোদ পিঠে নিয়ে ফিরে আসছে বকের সারি, পড়ন্ত সোনালি আলোয় গা ভাসিয়ে মাঝদরিয়ায় নৌকা বয়ে চলেছে ধীর লয়ে। সব আগের মতো। শুধু সে দিনের সঙ্গীটি নেই কবির পাশে। সেই বিষণ্ণতা আলগোছে ছুঁয়ে ফেলে পাঠকের মন। 'অন্যমনস্ক' কবিতাটিতে কবি এঁকেছেন চিন্তাক্লিষ্ট ঘুমহীন একটি রাতের সঠিক চিত্র। 'অন্যমনস্ক খুঁটে খাচ্ছে/ এক রাত/ নিদ্রাহীন।' 'পূর্ণতা' কবিতায় কবি বলেছেন, প্রিয় মানুষটির কাছে এলে কীভাবে সবকিছু বদলে যায়, হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে বৃষ্টির আর্দ্রতায়। আবার 'জন্মদিন' কবিতায় উঠে এসেছে কবির মৃত্যুচিন্তা, যা অবধারিত। 'ফুল ও মিষ্টির সোহাগে/ মৃত্যুর দিন উঁকি মারে/ গোপনে—/ জীবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে/ মৃত্যুর অনুশীলন।' আসলে জীবনের মধ্যেই রয়েছে মৃত্যুর গোপন পদসঞ্চার।

শব্দ রুমাল, বাংলা ছোট গল্প প্রসার আকাদেমি, মূল্য ৯০ টাকা

কমল ভট্টাচার্যর 'পেসমেকার' বইটি অনেকগুলি অণুগল্পের সংকলন। বর্ণনার বাহুল্য নেই, অকারণ মন খারাপের বিলাসিতা নেই। প্রত্যেকটি গল্পে উঠে এসেছে জীবনের একেকটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। 'পেসমেকার' গল্পটি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়ানো একটি মানুষের অপূর্ব দার্শনিক অনুভূতি— 'চোখ খুললে মীরা। আর বন্ধ করলে একটি সাদা কাপড়।' অন্য দিকে 'ভয়' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে সাধারণ নির্বিরোধী মানুষের সাতে-পাঁচে না থাকার পলায়নী মনোবৃত্তি। আসলে এসবই আমাদের চেনা, খুব চেনা অনুভূতি, যাকে আমরা অস্বীকারও করতে পারি না, স্বীকারও করি না। একটু অন্য ধরনের কথা বলেছে 'চেনা আগুন' গল্পটি। 'চিতায় তুলে মার ঠোঁটে আগুন ছোঁয়াতেই আগুন চমকে উঠল— এ আগুন মাকে চেনে খড়ির উনুন থেকেই।' সারাজীবন সংসারের আগুনে দগ্ধ হতে হতে যে নারী আজ চিতায় উঠেছে— চিতার আগুনও তাকে চেনে— নতুন করে আর কী পোড়াবে! বইটি পড়তে পড়তে চোখের সামনে ফুটে ওঠে জীবনের এক বিস্তৃত ক্যানভাস, যেখানে জীবন ও মৃত্যু হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে দুই সহোদরার মতো। 'মৃত্যুর চোখে দেখা' গল্পটিতে একজন মৃত মানুষ মৃত্যুর ওপার থেকে দেখছেন তাঁর মৃত্যুতে নেমে আসা বিষাদ। শোকতপ্ত সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে তাই বলে ওঠেন, 'বাবা, মৃত্যুর জন্য জীবন লাগে।' 'রোদ্দুর' গল্পটিতে এঁকেছেন জীবনের আনন্দ, কাজের মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ, নিজের সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ। 'বাড়ির নাম' গল্পটি এমনিতে বেশ মজার হলেও তার বুকের ভিতর সভ্যতার কান্নাটি গাঁথা রয়েছে। চারদিক ঢেকে নিচ্ছে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি। না আলো, না রোদ— আকাশহীন জীবন। 'ভালবাসা' গল্পটিতে নীরবতাই যেন এক শব্দমুখর বাস্তবতা, যা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

পেসমেকার, বাংলা ছোট গল্প প্রসার আকাদেমি, মূল্য ৬০ টাকা, কমল ভট্টাচার্য

শুক্লা রায়

কোচবিহারের ঐতিহ্যময় ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় নাম ক্যাবলা দত্ত

কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে সদ্য সমাপ্ত হল এস এন দত্ত মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বা ক্লাব ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম থেকেও এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন ক্লাব ক্রিকেট দল। এই টুর্নামেন্টের পোশাকি নাম এস এন দত্ত বা শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত হলেও এই রানিং ট্রফি কিন্তু ক্যাবলা দত্ত ট্রফি নামেই বেশি পরিচিত ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে। কোচবিহার এম জে এন ক্লাবের উদ্যোগে শুরু হয়ে বেশ কিছু বছর বন্ধ ছিল। ফের এ বছর থেকে শুরু হল এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

ক্যাবলা দত্তকে জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েক যুগ। তখন কোচবিহার স্বাধীন রাজ্য। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জেনকিন্স স্কুলের জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন একজন গেম টিচারকে। নাম শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত। আদ্যন্ত খেলা-পাগল এই মানুষটি একজন দক্ষ খেলোয়াড়ও ছিলেন। সে সময় কোচবিহারের মহারাজা বেঙ্গল ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেনও ছিলেন। আর এস এন দত্ত ছিলেন বেঙ্গল টিমের ডানহাতি লেগস্পিনার। তাঁর গুগলি ছিল মারাত্মক। কলকাতার কালীঘাট ক্লাবের হয়েও খেলতেন তিনি। যে বছর তাঁর ভারতীয় দলে থাকার কথা, ঠিক সেই সময় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে কোচবিহারে এই চাকরির প্রস্তাব দেন। সে সময় রেলের একটা চাকরিও করতেন তিনি। কিন্তু মহারাজের প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিনি কোচবিহারে এসে জেনকিন্স স্কুলে যোগ দেন। ভারতের হয়ে খেলা আর হয়নি তাঁর। কোচবিহারে এসে স্থানীয় জেলখানার কাছে সপরিবার থাকতে শুরু করেন। শুরু হয় তাঁর শিক্ষক জীবন। পোশাকি নাম মুছে গিয়ে হয়ে উঠলেন ছাত্রদের মাস্টারমশাই, আর সকলের প্রিয় ক্যাবলাদা।

ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সেও ক্যাবলা দত্ত ছিলেন সমান পারদর্শী। এম জে এন ক্লাবের বিলিয়ার্ড বোর্ডে তাঁর রেকর্ড স্কোর আছে। শোনা যায়, তিনি নাকি মহারাজাকে বিলিয়ার্ড খেলা শেখাতেন। দক্ষ খেলোয়াড়ের পাশাপাশি তাঁর ছিল জহুরির চোখ। ১৯৬৫ সালে যে বছর কোচবিহার আন্তর্জেলা ক্রিকেটে প্রথম

ডানদিকের প্রথমজন (দাঁড়িয়ে) ক্যাবলা দত্ত, বাঁ দিকে পতৌদি, মহারাজা ও জয়সিমা। ছবিটি রাজবাড়ির সামনে তোলা।

চ্যাম্পিয়ন হয়, তার ম্যানেজার ও কোচ ছিলেন তিনি। সেই বিজয়ী দলে ছিলেন মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় ছাত্র ময়না তরফদার। মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেন, রাজ আমলে কোচবিহার মহারাজা একাদশ ও সাহেবদের ডুয়ার্স ইলেভেনের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিক বাৎসরিক প্রীতি ম্যাচ হত। এইসব খেলার জন্য এম এল জয়সীমা, নবাব মনসুর আলি খান পতৌদি-সহ অনেক নামীদামি ক্রিকেটার আসতেন কোচবিহার মহারাজার হয়ে খেলতে। ফলে খুব কাছ থেকে এইসব ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কোচবিহারবাসীর।

১৯৬৫ সালে কোচবিহার জেলা দল যেবার চ্যাম্পিয়ন হয়, সেবার কোচবিহার দলে দুই পেস বোলার ছিলেন ময়না তরফদার ও কুণাল দাশগুপ্ত। তৃতীয় বোলার সুনীল বণিক এক ওভার বল করে পায়ে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে। তখন দু'দিনের ফাইনাল ম্যাচ হত। ছোট মাঠের জন্য সে দিন স্পিনারকে বল করতে দেওয়া হয়নি। বর্ধমানের বিরুদ্ধে ছিল ম্যাচটি। ক্যাবলা দত্ত টানা দু'দিন ওই দুই পেসারকে দিয়ে বল করিয়েছিলেন। তাদের লাঞ্চ পর্যন্ত করতে দেননি মাস্টারমশাই। কাস্টার্ড, পুডিং খাইয়ে রেখেছিলেন, খাবার খেলে যদি শরীর ভার হয়ে আসে, সে জন্য। বলেছিলেন, 'যদি জিততে পারিস, তবে যা খেতে চাইবি তা-ই খাওয়াব।' এবং পরে সত্যিই তিনি কথা রেখেছিলেন।

আর-এক ছাত্র রবিশংকর ভট্টাচার্য (মিন্টু)-র কথায়, 'স্কুলের মাঠ ছিল বিলিয়ার্ড বোর্ডের মতো। মাস্টারমশাই মাঠের অযত্ন সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অসাধারণ লাট্টু খেলতে পারতেন। ছাত্রদের কাছ থেকে লাট্টু নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানারকম কসরত দেখাতেন। মার্বেলও খেলতেন দারুণ। আমরা সবাই অবাক হয়ে যেতাম ওঁর অব্যর্থ টিপ দেখে। স্কুলের শতবার্ষিকীতে (১৯৬১) ছাত্র বনাম শিক্ষকদের ক্রিকেট ম্যাচে মাস্টারমশাই ব্যাট করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, ৮৮ রান করেছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যেই কোমরের ব্যথায় ব্যাটটাকে পিছনে ঠেকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।'

মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় আর-এক ছাত্র চঞ্চল গুহ উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সে সময় কালীপদ মুখার্জি হেডমাস্টার। বেশ রাশভারী মানুষ। কিন্তু এই ছাত্রকে ছাড়া স্কুল টিম হবে না। মাস্টারমশাই প্রবোধ গোস্বামীকে ধরে হেডমাস্টারের কাছে দরবার করে রীতি ভেঙে তাকে পাশ করান। খেলা ছাড়াও আর-একটা বিষয় ছিল ক্যাবলা দত্তর খুব প্রিয়, তা হল অভিনয়, বললেন তাঁর আর-এক ছাত্র স্বপনকুমার রায়। তিনি বললেন, 'সে সময় এম জে এন ক্লাব ছিল শহরের অভিজাতদের ক্লাব। তিনি সেই ক্লাবের সদস্যপদ পেয়েছিলেন। সেখানে ক্লাবের নিজস্ব নাটকের দল ছিল। তাদের নিজস্ব বেশ কিছু নাটকও ছিল। সেইসব নাটকে মাস্টারমশাই নিয়মিত অভিনয় করতেন। বাইরে থেকে নাটক করতে ক্লাবে আসতেন জহর রায়ের মতো অভিনেতারা।' ক্যাবলা দত্তর বড় ছেলে অমলেন্দু দত্ত বলেন, তিনি এতটাই খেলা-পাগল ছিলেন এবং মাঠের প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ ছিল যে, ছেলের বিয়ের দিনও মাঠে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর ক্যাবলা দত্ত আগের কোয়ার্টার ছেড়ে স্ত্রী ও চার ছেলে, তিন মেয়েকে নিয়ে বারোভুঁইয়া কলোনির ১৬ নং কোয়ার্টারে উঠে যান। সে সময় ২০০ টাকা মাইনে ছিল তাঁর। তখনকার দিনে বেশ ঈর্ষা করার মতো। কিন্তু আদ্যন্ত খেলাপ্রাণ এই মানুষটির শেষ বয়স খুব একটা ভাল কাটেনি। অসুস্থতায় কাটে বাকি জীবন।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-1, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় এবার প্রকাশিত হয়েছে এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন।

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

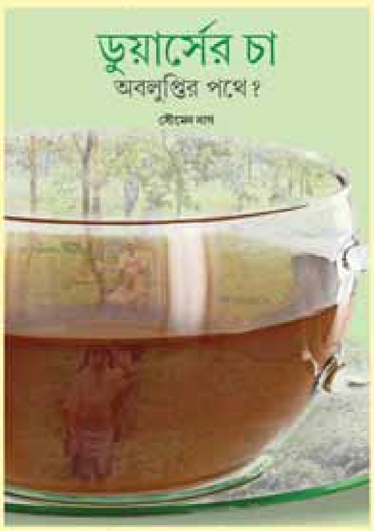

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ
মূল্য ১৫০ টাকা।

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

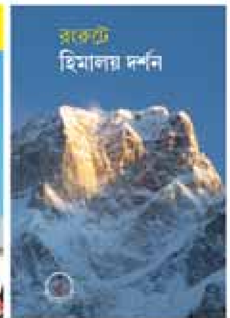

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

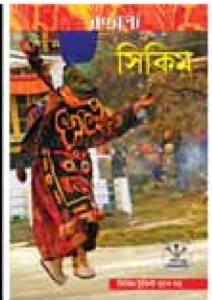

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

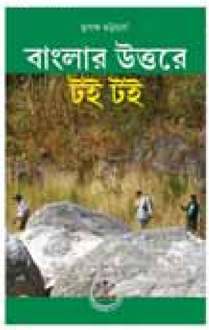

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

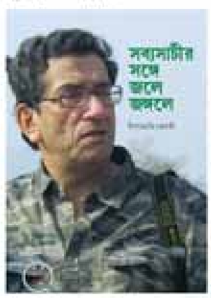

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.